ত্রৈমাসিক

ঃ ৩। সংখ্যা ঃ ১১। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISSN 1813 - 0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৩ সংখ্যা : ১১

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর পক্ষে এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭

যোগাযোগ : এস এম আবদুল্লাহ
সমন্বয়কারী
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
১৪ পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা)
শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : তাসনিম কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ৩৫ টাকা US $ 3

---

*Published by Advocate **MUHAMMAD NAZRUL ISLAM** General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 14, Pisciculture Bhaban (3rd Floor) Shymoli Bus Stand, Dhaka-1207, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US $ 3*

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

মানবতা ও সভ্যতার নিরাপত্তার জন্য অবিশ্বাসীদের অসৎ মনোবৃত্তির নিরসন হওয়া দরকার

বিশ্বাসীরা যেটা বিশ্বাস করে অবিশ্বাসীরা সেটা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে যেটা মানে অবিশ্বাসীরা সেটা মানে না। বিশ্বাসীরা যাতে বিশ্বাস করে যে কাজ করে অবিশ্বাসীরা তা করে না। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের চারিত্র পার্থক্যের ফিরিস্তি তৈরি করলে এভাবে একটা বিরাট ফিরিস্তি তৈরি করা যায়। দুনিয়ায় দেশে দেশে যুগে যুগে এটাই হয়ে আসছে। সভ্যতা সংস্কৃতি মানবিকতা এরি ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সীমারেখা তুলে দেবার বহু প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু কোনো কালেই তা সফলকাম হয়নি। এটাই মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব। মানবিকতার বিকাশ এরি ভিত্তিতে সম্ভবপর হয়েছে।

বিশ্বাস একটা ক্ষেত্র। অবিশ্বাসও একটা ক্ষেত্র। বিশ্বাস কি? ধরুন আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলীতে বিশ্বাস। আল্লাহ এক। মাত্র একজনই আল্লাহ। এর মধ্যে কোনো বিভাজন নেই। যেমন মা বেটা ও গড তিনে মিলে আল্লাহ। অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিনের সমন্বিত রূপ আল্লাহ। এটা মুশরিকদের ধারণা মাত্র। এ ধরনের কোনো বিশ্বাস মূলত বিশ্বাস নয়। এটা অবিশ্বাস। এক ও একক আল্লাহ যাকে তওহীদে খালেসা বলা হয় এবং যার মধ্যে আর কোনো প্রকার অংশীদারীত্বের কোনো অবকাশ নেই এমন ধরনের বিশ্বাসকেই বিশ্বাস বলা হয়।

আর অবিশ্বাস? সোজাসাপটা বলা যায়, বিশ্বাসের বিপরীত সবই অবিশ্বাস। আল্লাহকে এক না মানা অবিশ্বাস। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে কাউকে শরীক করা অবিশ্বাস। সামগ্রিকভাবে আল্লাহকে এক মানলে আসলে এক মানা হয় না। নিজের মতো করে আল্লাহকে এক মানলে এক মানা হয় না। আল্লাহ নিজে যেভাবে তাঁকে এক মানতে বলেছেন, সেভাবেই তাঁকে এক মানতে হবে, তবেই আল্লাহকে এক মানা হবে। অন্যথায় তাকে অবিশ্বাস বলা হবে।

তাই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য এবং কোন যোগসূত্র নেই। তাদের মাঝখানের ক্ষেত্র এমনভাবে সমান্তরাল হয়ে গেছে যে কোনোভাবে মিলবার নয়। তাই মহান আল্লাহ

বলেছেন, 'হে মুহাম্মদ, তুমি ইহুদি ও খৃস্টানদের মিল্লাতের অনুসারী না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনোক্রমেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।' (আল বাকারা, ১২০) অর্থাৎ তুমি তোমার পক্ষ থেকে তাদেরকে যতই ছাড় দাও না কেন তা তাদের কাছে মোটেই গ্রাহ্য হবে না। যতক্ষণ না তুমি তোমার বিশ্বাস ত্যাগ করে তাদের অবিশ্বাস গ্রহণ করো ততক্ষণ তারা তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে যেতে থাকবে। তোমার প্রতি নমনীয় হবে না এবং ইনসাফের নীতি অবলম্বন করবে না।

অবিশ্বাসীদের এই রীতি চিরকালীন। তারা ক্ষমতায় থাক বা ক্ষমতায় না থাক বিশ্বাসীদের প্রতি অসহিষ্ণু। বিশ্বাসের সূচনা পর্ব থেকেই পৃথিবীবাসী বিশ্বাসীদের প্রতি অবিশ্বাসীদের এ অসহিষ্ণু আচরণ দেখে আসছে। মক্কায় তের বছর তারা বিশ্বাসীদের প্রতি এ আচরণ করেছে। মদীনায় এসে বিশ্বাসীরা যখন ক্ষমতাশালী হলো তখনো অবিশ্বাসীদের আচরণের হেরফের হয়নি। অবিশ্বাসীদের অসহিষ্ণুতা লাগাতার যুদ্ধের সূচনা করলো। যুদ্ধে পরাস্ত হবার পরও তারা থেমে থাকলো না। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ছড়িয়ে দিল। দুটি পরাশক্তি বাইজান্টাইন ও পারস্য এই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হলো। তারপরও তাদের অসহিষ্ণুতা কমলো না। পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র ইউরোপ মিলে বিশ্বাসীদের ওপর দুশো বছরের একটা লাগাতার যুদ্ধ চাপিয়ে দিল। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারা বিশ্বাসীদের দুর্গে হানা দিয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। পৃথিবীব্যাপী বিশ্বাসীদের পূর্ণ পরাজয়ের পরও তাদের প্রতি অবিশ্বাসীদের অসহিষ্ণু আচরণে একটুও কমতি দেখা গেলো না।

আজ সারা বিশ্বে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের পদানত। শিক্ষার সমস্ত অঙ্গন অবিশ্বাসীদের পুরোপুরি দখলে। তাদের সীল মারা শিক্ষাই বিশ্বাসীদের এখানে গ্রহণীয়। জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য সবকিছুতে তাদের চিন্তা ভাবধারা একক প্রাধান্য বিস্তার করেছে। বিশ্ব অর্থনীতি তাদের নিয়ন্ত্রণে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে বিশ্বাসীদের কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিশ্বাসীদের অর্ধশতাধিক রাষ্ট্র আজ স্বাধীনতার পতাকা বহন করে চলেছে। তাই ওআইসি নামে একটা সংস্থা খাড়া করে দেয়া হয়েছে যার তেমন কোনো কার্যকারিতা নেই। অর্থাৎ বিশ্বাসীরা পৃথিবীতে কোনো সংগঠিত শক্তিই নয়। তারপরও তাদের প্রতি অবিশ্বাসীদের অসহিষ্ণু আচরণ শুধু বিস্ময়করই নয়, অভদ্রতারও চূড়ান্ত করে দেয়।

বিশ্বাসীদের নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তারা বিদ্বিষ্ট আচরণ করে আসছে শুরু থেকেই। তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার, তাঁর চরিত্রে কলংক লেপন এবং তাঁর চেহারা বিকৃত করে পেশ করায় তারা বিশেষ আনন্দ অনুভব করে। তারা মনে করে যে বিশ্বাসের সাথে তাদের শত্রুতা, যে বিশ্বাস হাজার দেড় হাজার বছরেও অবিশ্বাসের সাথে পাল্লা দিয়ে এখনো টিকে আছে এবং আবার নতুন শক্তি নিয়ে তাদের মোকাবিলায় এগিয়ে আসছে সে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এটা তাদের ক্রুশেড যুদ্ধের আর এক পর্ব। বিশেষ করে গত কয়েক বছর থেকে

ডেনমার্কসহ তথাকথিত সভ্যতাগর্বী ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের প্রিন্ট মিডিয়া বিশ্বাসীদের নবীর চরিত্রে মিথ্যা কলংক লেপন করে যে ধরনের ন্যাক্কারজনক ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন ছাপছে এবং সেই বিশ্বাসীদের দলছুট ও গুপ্ত শত্রু সালমান রুশদির বিশ্বাসীদের নবীকে শয়তানের প্রতিমূর্তি হিসেবে চিত্রিত করার পুরস্কার স্বরূপ সম্প্রতি বৃটেন তাকে নাইটহুডের সম্মানে ভূষিত করায় সারা দুনিয়ার মুসলমানরা বৃটেনের প্রতি যে ধিক্কার জানাচ্ছে তার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে বসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত নিউ ইয়র্ক টাইমসের গত জুনের এক সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে বরং বিশ্বাসীদের অভদ্র আচরণ এবং অপেক্ষাকৃত খারাপ মানুষ হওয়ার জন্য দুঃখবোধ করা হয়েছে।

আমরা জানি বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের নেতাদের প্রতি এ ধরনের আচরণ করে না, যা তারা বিশ্বাসীদের নেতা ও নবীর প্রতি করে আসছে। এরপরও অবিশ্বাসীরা তাদের নিজেদের দেশে তাদের নেতা বা যাদেরকে তারা নবী বলে মানে তাদের প্রতি অশালীন উক্তি বা আচরণের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান করে রেখেছে। কিন্তু বিশ্বাসীদের এখানে ঐ ধরনের কোনো আইন নেই।

বিশ্বাসীরা অন্যের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাদের নেতা, নবী, উপাস্য কারোর প্রতি অশালীন আচরণ বিশ্বাসীদের ধর্মীয় রীতি ও বিধান বিরোধী। তাই অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তাদের এ ধরনের আচরণের কোনো ট্রাডিশন ও অস্তিত্ব নেই। বিশ্বাসীদের এই পরম সহিষ্ণু মনোবৃত্তি ও ট্রাডিশনের প্রতি অবিশ্বাসীদের একটুও শ্রদ্ধাবোধ নেই। এখানে তারা কোনো ভদ্র আচরণ এবং অপেক্ষাকৃত ভালো মানুষী দেখে না। কেবল বিশ্বাসীদের নবীর প্রতি তাদের অভদ্র আচরণের জবাবে তারা বিশ্বাসীদের কাছ থেকে ভদ্র আচরণ ও ভালো মানুষী চায়। বিচিত্র এ অবিশ্বাসী মানসিকতা! বিচিত্র এ আধুনিক শঠতা! বিচিত্র এ জটিল সরলতা!

বিশ্বাসীদের বিশ্বাস এক্ষেত্রে এতই স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট যে তাদের এখানে এজন্য কোনো আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। কারণ এটা তাদের বিশ্বাসেরই একটা অংশ। নবীর প্রতি আচরণ বিদ্বিষ্ট হবার পর কোনো বিশ্বাসী আর বিশ্বাসীই থাকতে পারে না। কারণ আল্লাহর একক সত্তায় বিশ্বাস নবীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। নবীর মাধ্যম ছাড়া যে আল্লাহর সত্তা গঠিত হয় তা হয় শিরক মিশ্রিত। কাজেই নবীর প্রতি বিরূপতা আল্লাহর প্রতি বিরূপতার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই নবী বিদ্বেষী কোনো ব্যক্তি আর বিশ্বাসীই থাকতে পারে না। তাই এজন্য কোনো পৃথক ও স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু অবিশ্বাসীদের থেকে কি এতটুকু ভদ্রতাও আশা করা যায় না যে তারা লেখার ও লেখকের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বিশ্বাসীদের নেতা ও নবীর বিরুদ্ধে মিথ্যার কারবার চালানো বন্ধ করবে? তারা কি এতটুকু ভালো মানুষ হতে পারে না যে তাদের বিরোধী পক্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে যথার্থ মানবিক মর্যাদা দিতে শিখবে এবং তাঁর মর্যাদাহানির জন্য লেখকের স্বাধীনতা বা অন্য কোনো চোরাগোপ্তা পথ অবলম্বন করবে না? এ কারবার আর কতদিন চলবে?

মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা বিশ্বাসীদের এখানে কতটুকু তা অবশ্যই অবিশ্বাসীদের অনুধাবন করা উচিত। আল্লামা ইকবাল বলেছেন,

'মুস্তফা তেরা দেশ হ্যায়
তু মুস্তফবী হ্যায়'

অর্থাৎ হে বিশ্বাসী, মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন তোমার দেশ এবং তুমি হচ্ছো সেদেশের অধিবাসী। কাজেই দেশের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার কোনো দেশবাসীর নেই। দেশের বিরুদ্ধে কথা বললে সে দেশদ্রোহী হয়। আর দেশদ্রোহীর শাস্তি কি তা সবার জানা। তাই বলি অবিশ্বাসীরা যে শান্তি ও বিশ্বশান্তির বুলি আউড়িয়ে চলেছেন এভাবে দেশদ্রোহিতায় উস্কানি দিয়ে তা অর্জিত হতে পারে না।

আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা : ৯-২৮

সম্পদে নারীর অধিকার : একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা

মুহাম্মদ ছাইদুল হক

বর্তমান বিশ্বে যে সকল বিষয় নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছে এবং লক্ষ-কোটি বিলিয়ন ডলার এর পেছনে ব্যয় করা হচ্ছে তন্মধ্যে 'নারী অধিকার' ইস্যু অন্যতম। ইসলাম বিদ্বেষী দেশী ও বিদেশী সকল অপশক্তি একযোগে তাদের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে 'নারী অধিকার' ইস্যুটিকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগারের মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারী অধিকার, বিশেষত সম্পদে নারীর অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় সমাজ, সভ্যতা, সংস্থা ও ধর্মে জোরালো দাবি ওঠে। তবে নারীর অধিকার খতিয়ে দেখা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত নারী দশক (১৯৭৬ - ১৯৮৫) ছিল একটি বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ অনুমোদন করে এবং তা ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়। এতদসত্ত্বেও নারীর সামগ্রিক অধিকার, বিশেষত সম্পদে নারীর অধিকার বিষয়টি অমীমাংসিতই থেকে যায়।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে সকল বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান দানের সাথে সাথে এককালে সমাজে নিগৃহীত নারীদের সম্পদে অধিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। বিগত কয়েকশ বছরের বিশ্বে ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত না থাকায় ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় 'সম্পদে নারীর অধিকার' বিষয়টি মুসলমানরাও যেন ভুলতে শুরু করেছে। একদল ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিম ও তাদের প্রচার মিডিয়া ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার সম্পর্কে অপপ্রচারে মেতে উঠেছে। এদের অপপ্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একদল মুসলিম। তারা ইসলাম ঘোষিত উত্তরাধিকার আইন নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। এর ফলে কোন কোন সরলপ্রাণ মুসলিম বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং ইসলামকে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় সেকেলে ও পরিত্যক্ত মনে করছে। তাই বিষয়টি বর্তমান প্রেক্ষিতে সঠিকভাবে আলোচনার দাবি রাখে। আমরা আশা করি সম্পদে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করলে একদিকে ধর্মপ্রাণ অথচ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের বিবেক শাণিত হবে এবং তারা সম্পদে

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব সোশাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার বিষয়ে স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ করতে পারবে অপরদিকে ইসলাম বিদ্বেষী মহলের প্রচারণা খানিকটা হলেও হ্রাস পাবে।

সম্পদে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়

নারী সমাজ যে সকল ক্ষেত্রে সম্পদ লাভ করে তা হলো

১. বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় সম্পদে নারীর অধিকার, ২: মহানবী স.-এর নবুওয়াত-পূর্ব সমাজে নারীর সম্পদ লাভ, ৩. কন্যা সন্তানের গুরুত্ব, ৪. মীরাসী আইনের গুরুত্ব, ৫. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সম্পদ লাভের ক্ষেত্রসমূহ, ৬. মীরাস সম্পর্কে বিভ্রান্তির অপনোদন, ৭. সম্পদে নারীর অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে, ৮. বাংলাদেশের নারী সমাজ, ৯. উপসংহার।

তবে মূল আলোচনা শুরু করার পূর্বে 'সম্পদ'-এর পরিচয় জেনে নেয়া যাক।

'সম্পদ' (মাল)-এর পরিচয়

আরবী 'মাল' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ধন, সম্পদ, সম্পত্তি, ধন-সম্পদ ইত্যাদি। যেমন-১. মানুষের মালিকানাধীন বস্তুকে মাল বলে। অর্থাৎ 'মাল' এমন বস্তু যার প্রতি মানুষ স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়, যা সঞ্চয় করা যায়, যেমন- নগদ জিনিস (টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা ইত্যাদি) এবং যা নগদ জিনিসের বিকল্প হতে পারে।[১]

২. 'তুমি যে সমস্ত জিনিসের মালিকানা লাভ করেছ তাই 'মাল' (সম্পদ)।[২]

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন বস্তুর মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট বিদ্যমান থাকলে তাকে 'মাল' (সম্পদ) হিসাবে গণ্য করা হয়। (ক) জিনিসটি ব্যবহারযোগ্য, অন্য কথায় বলা যায়, জিনিসটি মানুষের জন্য উপকারী; (খ) জিনিসটির ব্যবহার শরী'আতে অনুমোদন করা হয়েছে এমন। অন্য কথায় বলা যায়, শরী'আত জিনিসটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করেনি। অতএব যে জিনিস ব্যবহারযোগ্য নয় অথবা যার ব্যবহার শরী'আতে সরাসরি নিষিদ্ধ তা 'সম্পদ' (মাল) নয়। যেমন- মদ, শূকর ইত্যাদি।[৩]

সম্পদ প্রধানত দুই প্রকার

ক. অস্থাবর সম্পদ : যে সম্পদ অবিকল অবস্থায় এবং তার প্রকৃতির পরিবর্তন না ঘটিয়ে স্থানান্তর করা সম্ভব তাকে অস্থাবর সম্পদ বলে। যেমন গৃহপালিত জীবজন্তু, উৎপাদিত দ্রব্য, নগদ অর্থ, সোনা-রূপা এককথায় যা সহজেই স্থানান্তর করা যায়।[৪]

খ. স্থাবর সম্পদ : যে সম্পদ অবিকল অবস্থায় এবং তার প্রকৃতির পরিবর্তন না করে স্থানান্তর করা সম্ভব নয় তাকে স্থাবর সম্পদ বলে। যেমন- জায়গা-জমি, দালান-কোঠা, গাছপালা ইত্যাদি।[৫]

বলাবাহুল্য উভয় প্রকার সম্পদেই নারী-পুরুষের অধিকার রয়েছে। কেননা কুরআন মজীদে আছে : 'পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক অথবা বেশি, একটি নির্ধারিত অংশ।'[৬]

এখন আমরা নারী সমাজের সম্পদ লাভের ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে আলোচনা করবো।

১. বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় সম্পদে নারীর অধিকার

ইসলামে সম্পদে নারীর অধিকার বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা সম্পদে নারীকে কি অধিকার দান করেছে তা আলোচনা করতে চাই।

হিন্দু ধর্মে

ভারতে নারীদের পরাধীনতা একটি অন্যতম বিষয়। মনু বলেন,[৬ক] নারী সমাজ তাদের কর্তার বশ্যতা স্বীকার করে দিন-রাত তাদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। এখানে উত্তরাধিকার আইন অনুপস্থিত। এই আইন থেকে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষরা তাদেরকে অধ:গতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।[৭] দায়ভাগ আইনে মৃত ব্যক্তির অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা জীবিত থাকলে কন্যাগণ কোন অংশ পায় না। অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অবর্তমানে কন্যাগণ উত্তরাধিকারী হলেও যে সকল কন্যা বন্ধ্যা কিংবা শুধু কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে তারা মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পায় না।[৮] মিতক্ষরা আইনে (মিতক্ষরা পদ্ধতি স্মৃতিকর ঋষি যাজ্ঞবল্কের স্মৃতি শাস্ত্রের প্রচলিত প্রবন্ধ) মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা মৃত পিতার সম্পদে অংশ পায় না। এ আইনের আওতায় কন্যার সম্পদ না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। কারণ উল্লিখিত ব্যক্তিদের কেউ না কেউ বেঁচে থাকেই।[৯]

বৌদ্ধ ধর্মে

বৌদ্ধদের পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। তবে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন দ্বারা শাসিত।[১০]

ডি এফ মোল্লার Principal of Hindu Law এর অনুচ্ছেদ Persons governed by Hindu Law তে বলা হয়েছে- 'Hindu Law applies (iv) to Jaina, Buddhists in India, Sikhs except so far as such Law varied by custom.'

অর্থাৎ 'ভারতের জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব প্রথাসম্মত আইন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত'।[১১]

ইহূদী ধর্মে

ইহূদী ধর্মে নারীকে সকল পাপের কারণ এবং পুরুষের প্রতারক বলা হয়েছে। কাজেই নারী উপেক্ষার পাত্রী। ইহূদী ধর্মে পিতা নিজ কন্যাকে বিক্রয় করে দিতে পারতো এবং তার কোন উত্তরাধিকার স্বত্ব স্বীকৃত ছিল না।[১২]

খ্রিষ্ট ধর্মে

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। তবে ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের (Act 93 of 1925) ২৩-২৮ (অংশ-

৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারাসমূহ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের জন্য উত্তরাধিকার আইন সমভাবে প্রযোজ্য। এ আইনের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী নয় এমন দু'জনের মিলনে যে সন্তান জন্মলাভ করেছে সে উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না। এখানে নারী-পুরুষের অবৈধ মিলনকে চেপে গিয়ে জারজ সন্তানকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। যুক্তরাজ্যের আইন অনুসারে বহু বিবাহের মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তান উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না।[১৩] মোটকথা খ্রিষ্ট ধর্মের উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা প্রত্যেকেই কমবেশি উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে কিন্তু নির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ নেই।[১৪]

১৮০৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ আইনে স্বামী স্ত্রীকে বিক্রয় করে দেয়ার অধিকার ছিল। নারীরা অধিকারহীনা থাকতো এবং নিজ সম্পদও স্বামীর অনুমতি ছাড়া ভোগ-ব্যবহার করতে পারতো না।[১৫]

রোমান সভ্যতায়

রোমান সভ্যতায় নারী সব সময়ই অন্যের অধীনস্থ ছিল। বিবাহিত নারী এবং তার সম্পদ উভয়ই স্বামীর নিয়ন্ত্রণে থাকতো। নারী ছিল তার স্বামীর ক্রীত সম্পত্তি এবং ক্রীতদাসীর ন্যায় পুরুষের স্বার্থে ব্যবহৃত হতো। নারীর কোন নাগরিক অধিকার স্বীকার করা হতো না।[১৬]

ইংলিশ কমন ল'

এ আইনে বিবাহের পর নারীর সমুদয় সম্পদ তার স্বামীর অধীনে থাকার কথা বলা আছে। পরবর্তী কালে আদালত রায় প্রদান করে, স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামী তার কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারবে না। তবে স্বামী তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতে পারবে এবং প্রয়োজনে তা থেকে ব্যয় করতে পারবে।[১৭]

২. মহানবী স.-এর নবুওয়াত-পূর্ব সমাজে সম্পদে নারীর অধিকার

অধিকার বলতে যা বুঝায় তদানীন্তন আরব সমাজে তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। নারীর উত্তরাধিকার, দেনমোহরের অধিকার কিংবা বিবাহ-তালাক কোন কিছুতে মতামত প্রদানের যেমন কোন সুযোগ ছিল না তদ্রূপ তার কোন অধিকারও স্বীকৃত হতো না। কোন পুরুষ তার স্ত্রী রেখে মারা গেলে ঐ মৃতের অন্য কোন স্ত্রীর ঔরসজাত পুত্র সন্তান থাকলে তখন পিতার পরিত্যক্ত সম্পদের ন্যায় তার সৎ মায়ের উত্তরাধিকারী হতো এবং ইচ্ছা করলে তাকে স্ত্রী হিসাবেও গ্রহণ করতে পারতো।[১৮]

মহানবী স.-এর নবুওয়াত-পূর্ব জাহিলী সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।[১৯] লোকজন তাদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাদের অবস্থা কীরূপ হতো সে প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে : 'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তাদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে

সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানিহেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতো নিকৃষ্ট!'[২০]

কন্যা সন্তানের ব্যাপারে তদানীন্তন আরবদের মনোভাব ছিল অত্যন্ত জঘন্য। তারা কন্যা সন্তানকে পরিবারের জন্য বোঝা মনে করতো। কাজেই তারা তাকে মেরে ফেলাই শ্রেয় মনে করতো। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : 'তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করবে না। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ।'[২১]

৩. কন্যা সন্তানের গুরুত্ব

সন্তান প্রতিপালন করার প্রতি ইসলাম অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, বিশেষভাবে কন্যা সন্তান প্রতিপালনের জন্য বিপুল সওয়াবের কথা ঘোষিত হয়েছে।

মহানবী স. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করলো, আমি এবং সে কিয়ামতের দিন এভাবে থাকবো - এই কথা বলে তিনি তাঁর দুই হাতের আংগুলগুলো একত্র করে দেখালেন।'[২২]

মহানবী স. আরো বলেছেন : 'তোমরা কন্যা সন্তানদের ঘৃণা করো না।'[২৩]

মহানবী স. আরো বলেছেন : 'হে আল্লাহ! আমি এই দুই প্রকার দুর্বল লোকের অধিকার খর্ব করা নিষিদ্ধ করেছি। তারা হলো, এতীম ও নারী।'[২৪]

হযরত ইমরানের স্ত্রী হান্না আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্তভাবে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে কবুল করো, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। অতঃপর যখন সে তা প্রসব করলো তখন বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। অথচ সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ তা সম্যক অবগত। আর ছেলে তো এই মেয়ের মত নয় ... ।'[২৫]

এই কন্যা সন্তান হযরত মারয়াম কালক্রমে জগদ্বিখ্যাত মহিয়সী নারী হয়েছিলেন, কুরআন মাজীদে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর গর্ভে বিশিষ্ট নবী হযরত ঈসা আ. জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং কন্যা সন্তানকে কোন পর্যায়ে তুচ্ছজ্ঞান করার অবকাশ নেই।

৪. মীরাসী আইনের গুরুত্ব

ইসলামে মীরাসী আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ আইন যেমন দুনিয়ায় অর্থনৈতিক মুক্তির পথ সুগম করে অপরদিকে আখিরাতের নাজাতও নিশ্চিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

'এগুলো হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে

তিনি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।'[২৬]

মহানবী স. বলেছেন: 'তোমরা নিজেরা ফারায়েয (উত্তরাধিকার আইন) শিক্ষা করো এবং লোকজনকে তা শিক্ষা দাও। কেননা এটা (ইসলাম সম্পর্কীয় যাবতীয়) জ্ঞানের অর্ধেক।'[২৭]

এক মনীষী বলেন, 'আধুনিক সভ্য পৃথিবী ধন সম্পদ বণ্টনের যত নিয়ম ও পন্থা আবিষ্কার করেছে, ইসলাম ঘোষিত উত্তরাধিকার আইন তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক ও নির্ভুল। এ আইনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যও নিখুঁত।'[২৮]

৫. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সম্পদ লাভের ক্ষেত্রসমূহ

ক. কুরআন মাজীদে ঘোষিত অধিকার : বর্তমান বিশ্বে নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার বিষয়টি অত্যন্ত আলোচিত বিষয়। তবে যারা এ বিষয়ে অত্যন্ত সোচ্চার মূলত তাদের দ্বারাই নারী অধিকার সবচেয়ে বেশি ক্ষুণ্ন হয়েছে ও হচ্ছে। একমাত্র ইসলামই নারী অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। কুরআন মাজীদের সূরা নিসা'র ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৩ ও ১৭৬ আয়াতে উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন মাজীদে ঘোষিত মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার লাভকারীদের ৬টি অংশ বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে- $^{১}/_{২}$, $^{১}/_{৪}$, $^{১}/_{৮}$, $^{২}/_{৩}$, $^{১}/_{৩}$ এবং $^{১}/_{৬}$ অংশ। এই ছয় প্রকার অংশের জন্য কুরআন মাজীদে মৃতের স্বত্ব লাভকারীদের সংখ্যা ১২ জন বলা হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪ জন এবং নারীর সংখ্যা ৮ জন।

৪ জন পুরুষ হলেন : ১. পিতা, ২. দাদা, ৩. বৈপিত্রেয় ভাই ও ৪. স্বামী।

মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে অংশপ্রাপ্ত ৮ জন নারী হলেন : ১. স্ত্রী, ২. কন্যা, ৩. পুত্রের কন্যা, ৪. মাতা, ৫. সহোদর বোন, ৬. বৈমাত্রেয় বোন, ৭. বৈপিত্রেয় বোন, ৮. দাদী/নানী। তবে এখানে কেবল সম্পদে নারীর অধিকার বিষয়ে আলোচনা সীমিত থাকবে।

অবস্থা ভেদে (১) স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদে ১/৪ বা $^{১}/_{৮}$ অংশ, (২) কন্যা $^{১}/_{২}$ বা $^{২}/_{৩}$ এবং কন্যার সাথে পুত্র একত্র হলে 'নারীর দ্বিগুণ অংশ পুরুষের' (২:১ আনুপাতিক হারে), (৩) কন্যা সন্তানের অবর্তমানে পুত্রের কন্যা বর্তমান থাকা অবস্থায় $^{১}/_{২}$ বা $^{২}/_{৩}$, তবে মৃতের একটি কন্যা থাকলে সে $^{১}/_{২}$ এবং পৌত্রীগণ $^{১}/_{৬}$, (৪) মা $^{১}/_{৩}$ বা $^{১}/_{৬}$, (৫) সহোদর বোন $^{১}/_{২}$ বা $^{২}/_{৩}$, (৬) বৈপিত্রেয় বোন $^{১}/_{৬}$ বা $^{১}/_{৩}$, (৭) বৈমাত্রেয় বোন $^{১}/_{২}$ বা $^{২}/_{৩}$, (৮) দাদী/ নানী $^{১}/_{৬}$ অংশ পাবে।

খ. ব্যবসায়িক সম্পদে নারীর অধিকার : ইসলাম নারীদের যেসব অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে তন্মধ্যে তার পরিচালনাধীন ব্যবসায়িক সম্পদে তার অধিকারের বিষয়টি অন্যতম। নারী তার এ অধিকার থেকে অতীতে যেমন বঞ্চিত ছিল তদ্রূপ বর্তমান শতাব্দীতেও যে পুরোপুরি অধিকার লাভ করেছে তা বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ১৯৩৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত ফরাসী আইন

অনুযায়ী নারীদের কোন প্রকার চুক্তি স্বাক্ষর করার অধিকার ছিল না। এমনকি একজন বিবাহিত নারীকে তার নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করার জন্যও তার স্বামীর অনুমতি নিতে হতো।[২৯]

ইসলামী আইনের আওতায় নারী যে কোন ধরনের বৈধ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। তবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী তার মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ দু'জন বালেগ ও বুদ্ধিমান নারী-পুরুষ দু'জন বালেগ ও বুদ্ধিমান সাক্ষীর উপস্থিতিতে সহজেই বিবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে আল্লাহ বলেন : 'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে তা লিখে দেয়, লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। যেমন আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লেখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালককে ভয় করে আর তার কিছু যেন না কমায়। তবে ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। যাদের উপর তোমার আস্থা আছে তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী লোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুলে গেলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে। সাক্ষীদেরকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। বিষয় ছোট হোক কি বড়, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হবে না। আল্লাহর নিকট এ হচ্ছে ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর ... ।[৩০]

বর্ণিত আয়াত থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন বৈধ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে।

বিশেষত ইসলামী আইনে একজন নারীর নিজের ব্যবসায়িক সম্পদ, জমি-জমা এবং অন্যান্য সম্পদে অধিকার স্বীকৃত। বলাবাহুল্য, একজন নারী তার বিবাহ-পূর্ব কিংবা বিবাহ-পরবর্তী জীবনে যে সম্পদ লাভ করবে তার উপর তার নিরংকুশ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে : 'পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।'[৩১]

মহানবী স.-এর যুগেও বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা সাহাবী ব্যবসায়িক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রা.-এর ব্যবসা বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। উম্মে আনমার, আসমা বিনতে মাখরামা, খাওলা, মুলায়কা রা. প্রমুখ আতরের ব্যবসা করতেন।[৩২]

এ ছাড়া কিছু সংখ্যক মহিলা সাহাবী হস্তশিল্প কর্মেও যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন সাওদা রা. চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতেন।[৩৩]

গ. চাকুরীর মাধ্যমে অর্জিত সম্পদে নারীর অধিকার : ইসলামের মূলনীতি হলো, 'ক্ষেত্র বিশেষে কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সাধারণভাবে যে কাজ বা পেশা পুরুষের জন্য বৈধ তা নারীর জন্যও বৈধ।' ইসলামের নীতিমালা ও নৈতিকতার সাথে সংগতি রেখে মহিলারা তাদের জন্য সহজসাধ্য যে কোন চাকুরী বা পেশায় নিয়োজিত হতে পারে। সহজসাধ্য পেশার কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, ইসলাম

নারীদেরকে কঠোর শ্রমসাধ্য কাজে, যেমন খনির অভ্যন্তরে, লৌহজাত দ্রব্যাদি নির্মাণ কারখানায় ইত্যাদিতে নিয়োজিত হওয়া পছন্দ করে না। তাদের জন্য শিক্ষকতা, ডাক্তারী, সেবাধর্মী কার্যক্রম ইত্যাদিতে নিয়োজিত হওয়া পছন্দনীয়। সে তার শালীনতা, মর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলবে।

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র.-এর মতে, নারী শ্রম-বিনিয়োগের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে।[৩৪]

এ অভিমত থেকে নারীর চাকুরীতে নিয়োগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। ইসলাম নারীকে মসজিদে, বাজারে ও হজ্জে যাবার অনুমতি দিয়েছে। তবে স্বামীর ঘরে অর্থ যোগানদানে সে বাধ্য নয়, তার অর্থ ব্যয় হবে স্বামীর প্রতি অপূর্ব প্রীতির দৃষ্টান্ত অথবা সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব পালন।[৩৫]

কোন অবিবাহিত নারী যদি কোন পেশা অবলম্বনের মাধ্যমে সম্পদের মালিক হয়, তবে সে তার উপার্জন থেকে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তবে একথা স্বত:সিদ্ধ যে, কন্যার বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পিতা তার ভরণ- পোষণের জন্য দায়ী।[৩৬]

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত এক হাদীসে আছে, তার খালা এবং রসূলুল্লাহ স.-এর এক মহিলা সাহাবী তার ইদ্দত চলাকালে তার খেজুর বাগান থেকে খেজুর কেটে সংগ্রহ করার জন্য নবী স.-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি বললেন : 'বের হয়ে বাগানে যাও, তোমার খেজুর কাটো। এর বিক্রিত অর্থ হয়ত তুমি দান-খয়রাত করবে অথবা অন্য কোন ভাল কাজে ব্যয় করবে।'[৩৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর স্ত্রী এবং রসূলুল্লাহ স.-এর মহিলা সাহাবী হযরত যয়নব রা.-এর কুটির শিল্প ছিল। তিনি তার উপার্জিত অর্থ দিয়ে স্বামী ও সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। তিনি নবী স.-এর নিকট গিয়ে তাঁকে অবহিত করলেন, 'আমি একজন কারিগর মহিলা। আমি তৈরী করা দ্রব্য বিক্রয় করি। এছাড়া আমার স্বামী একজন গরীব লোক। তাঁর সন্তানের জীবিকার অন্য কোন ব্যবস্থাও নেই। তিনি জানতে চাইলেন, তিনি কি তার উপার্জিত অর্থ স্বামী সন্তানের জন্য ব্যয় করতে পারবেন? নবী স. বললেন : হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য ব্যয় করো এবং এজন্য তুমি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।'[৩৮]

কর্মক্ষেত্রে নারী তথা নারীর ঘরের বাইরে যাওয়া এবং চাকুরীতে যোগদান নিষিদ্ধ নয়, বরং এজন্য অনুমতি রয়েছে। মহানবী স. বলেছেন : '(হে নারী সমাজ!) আল্লাহ প্রয়োজনে তোমাদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন।'[৩৯]

পুরুষের ন্যায় নারীরও দুনিয়ার সুখ দুঃখে অংশীদার হওয়ার ন্যায্য অধিকার রয়েছে। ইসলাম নারীকে হালালভাবে অর্থ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। যেমন মহিলা সাহাবী আসমা বিনতে মাখরাম রা. আতর ব্যবসায়ী ছিলেন।[৪০] খাওলা বিনতে সা'লাবা রা. তাঁর স্বামীর সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন।[৪১]

এ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিটি কর্মক্ষম নারীর ঘরের বাইরে গিয়ে শালীনতা ও পর্দা সহকারে অর্থ উপার্জনের বিষয়টি অনুমোদন দিয়েছে ইসলাম।

ঘ. অসিয়ত : যারা শরয়ী আইনে মীরাসের অধিকার লাভ করে না বা বিশেষ কারণে মীরাস পায় না তাদের ব্যাপারে ইসলাম সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করার বিধান রেখেছে। হযরত সা'দ রা. রোগাক্রান্ত হলে রসূলুল্লাহ স.-কে বললেন : 'আমার অনেক সম্পদ এবং একটি মাত্র কন্যা সন্তান আছে। আমি কি আমার সমুদয় সম্পদ দাতব্য উদ্দেশ্যে অসিয়ত করতে পারি? তিনি বললেন: না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন : না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তবে এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন: হাঁ। তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তোমার সন্তানকে দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাওয়ার তুলনায় সম্পদশালী রেখে যাওয়া অধিক উত্তম, যাতে তারা অপরের নিকট হাত পাততে বাধ্য না হয়।'[৪২]

এ অসিয়ত পুরুষের জন্য যেমন করা যায় তদ্রূপ করা যায় নারীর ক্ষেত্রেও। অন্যভাবে বলা যায়, এ অসিয়ত একজন পুরুষ যেভাবে করতে পারে, তদ্রূপ একজন নারীও তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করতে পারে।

ঙ. স্বামীর সম্পদ বনাম স্ত্রীর সম্পদ : স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে স্ত্রী প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে এবং দান-খয়রাতও করতে পারবে। এজন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন হবে না। কেননা হাদীসে আছে, 'স্ত্রী যদি তার স্বামীর উপার্জিত সম্পদ থেকে তার অনুমতি ছাড়া কিছু ব্যয় করে তবে স্বামী তার অর্ধেক সওয়াব পাবে।'[৪৩]

'মুদার গোত্রের এক মহিলা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আমরা তো আমাদের পিতা, পুত্র ও স্বামীদের উপর বোঝা স্বরূপ। এমতাবস্থায় তাদের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করার কোন অধিকার আমাদের আছে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তোমরা তাজা খাদ্য আহার করবে এবং অপরকে উপহার দিবে।'[৪৪]

মহানবী স. বলেছেন : 'একটি দীনার যা তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ, একটি দীনার যা তুমি কোন দাসকে দাসমুক্তির জন্য ব্যয় করেছ, একটি দীনার যা তুমি কোন দরিদ্রকে দান করেছ এবং একটি দীনার যা তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ -এ সবের মধ্যে তুমি সবচেয়ে বেশি সওয়াব পাবে সেই দীনারের জন্য যা তুমি নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ।'[৪৫]

ইমাম শাওকানী র. বলেন, এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের পিতা, পুত্র ও স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে তাদের অনুমতি ছাড়া পানাহার করা এবং অপরকে উপহার-উপঢৌকন দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয।[৪৬]

চ. দেনমোহর : একজন নারী মীরাস স্বত্ব ছাড়াও দেনমোহর বাবদ বিরাট অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করে থাকে। উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীদের দেনমোহরের কোন ব্যবস্থা ছিল না। যদিও কখনো দেনমোহর আদায় করা হতো তা সবই নারীর পিতা কিংবা অপরাপর অভিভাবক লুটেপুটে খেয়ে ফেলতো। পক্ষান্তরে নারী তার দেনমোহর হতে বঞ্চিতই থেকে যেতো। কখনো বিবাহোত্তর স্বামীও স্ত্রীর সম্পদ হাতিয়ে নিতো। ইসলাম স্বামীর উপর তার স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেছে এবং দেনমোহরের উপর স্ত্রীর নিরংকুশ অধিকার

দিয়েছে। কাজেই স্ত্রী তার দেনমোহর লাভ করে স্বাধীনভাবে তা ব্যয় করতে পারবে। এতে তার অভিভাবক কিংবা স্বামী বা অন্য কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। স্বামীর উপর স্ত্রীর দেনমোহর আদায় করা ফরয। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে : 'তারপর যে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ তোমরা তাদের মাধ্যমে গ্রহণ করো তার বদলে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে আদায় করো।'[৪৭]
অপর এক আয়াতে আছে : 'তাদের (স্ত্রী) একজনকে যদি অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা হতে কিছুই ফেরত নেবে না।'[৪৮]
অন্য এক আয়াতে আরো আছে : 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা প্রদান করেছো তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়।'[৪৯]
অপর এক আয়াতে আছে : 'সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।'[৫০]
মহানবী স. বলেছেন : 'বিবাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপালনযোগ্য শর্ত হলো, তোমরা দেনমোহর আদায় করবে। কেননা এর দ্বারাই তোমরা দাম্পত্য অধিকার লাভ করে থাক।'[৫১]
অপর এক হাদীসে আছে : 'যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট দেনমোহর ধার্য করে কোন নারীকে বিবাহ করে অথচ আল্লাহ জানেন যে, সে প্রকৃতপক্ষে দেনমোহর আদায় করবে না, এমতাবস্থায় সে আল্লাহর সাথে প্রতারণা করল এবং সে যেন তার স্ত্রীকে হালাল করার চুক্তি বাতিল করলো এবং সে কিয়ামতের দিন একজন ব্যভিচারী হিসাবে উপস্থিত হবে।'[৫২]

৬. মীরাস স্বত্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তির অপনোদন

ইসলামী জীবন বিধানে মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার নিকটতম সম্পর্ক যেমন একটি স্থায়ী মূলনীতি, তেমনি নারীর তুলনায় পুরুষের দ্বিগুণ প্রাপ্তিও একটি স্থায়ী মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলার বাণী : 'এক পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান।'[৫৩] এ বিষয়ে একদল অমুসলিম এবং কিছু সংখ্যক তথাকথিত মুসলিম ঘোর আপত্তি জানায় এবং ইসলাম নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে। কাজেই এজন্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এর ফলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ইসলাম বিরোধীদের প্রতারণা থেকে নিজেদের রক্ষায় সক্ষম হবে। মুসলিম পণ্ডিতগণ বিষয়টির একাধিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
১. ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে, 'প্রত্যেক মানুষের উপর তার প্রাপ্তি অনুপাতেই দায়িত্ব বর্তায়'। একজন পুরুষের উপর যে ধরনের ও যতখানি আর্থিক দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, সে তুলনায় একজন নারীর দায়িত্ব অনেক কম, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়িত্ব মুক্ত। কেননা পুরুষ নারীকে দেনমোহর, বাসস্থান, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে স্বামীর কোন প্রকার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ স্ত্রীর জন্য আবশ্যিক নয়। আল কুরআনে বলা হয়েছে : 'পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তা এজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে ... ।'[৫৪]

২. স্ত্রীর সার্বিক দাবি পূরণের সাথে সাথে স্বামী তার সন্তান-সন্ততি এবং সংসারের অন্যান্য সদস্যের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতে বাধ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের (সন্তান-সন্ততির) ভরণ- পোষণ করা।'[৫৫]

ইসলাম নারীকে সকল প্রকার আর্থিক দায়িত্ব বহন থেকে অব্যাহতি দিয়েও কেবলমাত্র মীরাসের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক সম্পদ দিয়ে যে কত বড় উদারতা প্রদর্শন করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হাদীসে আছে : 'যখন কোন ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান এবং আখিরাতে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে, তার এ ব্যয় দান হিসাবে গণ্য হয়।'[৫৬]

উল্লেখ্য যে, সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারের অপরাপর সদস্যদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষকেই বহন করতে হয়, নারীকে নয়; তিনি মা, স্ত্রী, বোন, কন্যা যে পর্যায়ের নারীই হোন। কাজেই নারীর তুলনায় পুরুষের দ্বিগুণ মীরাসী সম্পদ পাওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত।

৩. বাহ্যত পুরুষের মীরাস নারীর তুলনায় বেশি (অর্থাৎ নারীর তুলনায় পুরুষের সম্পদ দ্বিগুণ) মনে হয়। মধ্যপ্রাচ্যের খ্যাতিমান চিন্তানায়ক শায়খ আলী আস সাবুনী তাঁর 'আল-মাওয়ারীসু ফিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যা' গ্রন্থে উপমা দিয়ে নারী-পুরুষের মীরাসের বিষয়ে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'মনে করুন, কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে তিন হাজার টাকা এবং একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে গেলো। ইসলামের মীরাসী আইন মোতাবেক ছেলে পায় দুই হাজার টাকা এবং মেয়ে পায় এক হাজার টাকা। এহেন অবস্থায় ছেলেটি বিবাহ করে তার স্ত্রীকে দুই হাজার টাকা দেনমোহর দিল। এখন সে কপর্দকহীন। অতঃপর তার বোনের বিবাহ হলো। সে তার স্বামীর নিকট থেকে দেনমোহর বাবদ দুই হাজার টাকা লাভ করলো। এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে, মেয়েটি তার মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ভাইয়ের তুলনায় অর্ধেক সম্পদ লাভ করেও এখন তিন হাজার টাকার মালিক। পক্ষান্তরে তার ভাই পিতৃ-প্রদত্ত সম্পদ থেকে বোনের তুলনায় দ্বিগুণ সম্পদ পাওয়া সত্ত্বেও এখন সে কপর্দক শূন্য। অথচ এরপরও তাকে স্ত্রীর ভরণপোষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা, সন্তান-সন্ততির যাবতীয় ব্যয়ভার বহন, মাতা ও ভাইবোনদের দায়িত্ব অপরিহার্যভাবে পালন করতে হয়। পক্ষান্তরে তার বোন তিন হাজার টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার উপর স্বামী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, এক কথায় কোন প্রকার অর্থনৈতিক দায়িত্ব বর্তায় না। এবার ভেবে দেখুন! বাহ্যিকভাবে ছেলের প্রাপ্ত সম্পদ দ্বিগুণ এবং মেয়ের সম্পদ অর্ধেক মনে হলেও বিষয়টি তদ্রূপ নয়। কারণ ছেলের প্রাপ্ত অংশ সবই খরচ হয়ে যায়, উপরন্তু তাকে অহির্নিশ রুজি-রোজগারের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। পক্ষান্তরে মেয়েকে কোন প্রকার আর্থিক দায়িত্ব পালন করতে হয় না, বরং তার প্রাপ্ত অংশ তার কাছে অক্ষত থেকে যায়। কাজেই উপরোক্ত অভিযোগ আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. নারী তার স্বামীর নিকট থেকে দেনমোহর পেয়ে থাকে। পক্ষান্তরে পুরুষকে দেনমোহর পরিশোধ করতে হয় এবং এটা স্বামীর উপর ফরয। কেননা কুরআন মাজীদে আছে : 'তোমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নারীদেরকে তাদের দেনমোহর প্রদান করো।'[৫৭]

হিসাব করলে দেখা যায়, নারী পুরুষের তুলনায় কম তো নয়ই, বরং সর্বসাকুল্যে স্বামীর তুলনায় অধিক সম্পদ লাভ করে থাকে। কাজেই আপত্তিকারীদের অভিযোগ মোটেও ঠিক নয়, বরং তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

৫. একজন নারী তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার ভাইয়ের তুলনায় অর্ধেক পেলেও দাদা, স্বামী ও বৈপিত্রেয় ভাই থেকে সম্পদ লাভ করে থাকে, যা একত্র করলে ভাইয়ের তুলনায় অনেক বেশি হয়। কাজেই ইসলাম নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে- এ অভিযোগ সর্বৈব অবাস্তব ও অপপ্রচার।

এ পর্যায়ে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত না করে উত্তরাধিকারে সমতা দাবি করার কোন যৌক্তিকতা নেই। এটি একটি সুস্পষ্ট পরিপূরক দর্শন। এটিকে আংশিকভাবে বর্জন বা গ্রহণের অবকাশ নেই। কেননা কুরআন মাজীদে আছে : 'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা-অপমান এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে।'[৫৮]

কুরআন মাজীদের অপর এক আয়াতে আছে : 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।'[৫৯]

সুতরাং সৃষ্টির জন্য কি কল্যাণকর এবং কি কল্যাণকর নয় তা কেবল আল্লাহ তা'আলাই উত্তমরূপে অবগত।

৬. ইসলাম নারীকে তার জীবনের সকল পর্যায়ে অর্থনৈতিক সকল দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে। বিবাহের পূর্বে তার ভরণ-পোষণ, লেখাপড়াসহ যাবতীয় খরচ তার পিতা বা অভিভাবকের উপর বর্তায় এবং বিবাহের পর এ দায়িত্ব বর্তায় তার স্বামীর উপর। উপরন্তু স্ত্রী বিবাহের পর স্বামীর নিকট থেকে দেনমোহর লাভ করে থাকে, যা পুরুষ লাভ করে না।[৬০] কাজেই যারা বলে, মীরাসী স্বত্বে নারীকে ঠকানো হয়েছে এটা তাদের অজ্ঞতারই প্রমাণ। কারণ নারী দেনমোহর লাভ করে এবং পুরুষের দেনমোহর লাভের কোন সুযোগ নেই~ একথাটি কিন্তু ইসলাম বিরোধী শক্তি খতিয়ে দেখে না বরং পাশ কাটিয়ে যায়।

৭. সমাজে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার দাবি সকল ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুইডেনে এমন আইন চালু আছে যে, এক সন্তান জন্ম নেবার পর মায়েরা যদি মাতৃত্ব ছুটি ভোগ করে, পরের সন্তানের বেলায় বাবারা সেই ছুটি ভোগ করতে পারে এবং মায়েরা বাইরে কাজ করে। শুধুমাত্র সমঅধিকারের দাবিতে এই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নিয়মটা কতটা বাস্তবসম্মত ও যুক্তিযুক্ত সেটাও ভেবে দেখা দরকার। কাজেই মীরাসী সম্পদ লাভের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অংশ দাবি করা মোটেও যুক্তিসংগত নয়।[৬১]

৮. যে সমাজে নারীর জীবন রক্ষার বিষয়টিই ছিল চ্যালেঞ্জ সে সমাজে তার উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি প্রদান ছিল নি:সন্দেহের যুগান্তকারী এক বিপ্লবী পদক্ষেপ। কাজেই কে বেশি পেলো এবং কে কম পেলো সে দাবি উত্থাপন করার নৈতিক অধিকার ঐসব লোকের নেই যারা মহিলাদের উত্তরাধিকার এক সময় স্বীকার করতো না এবং এখনও বাস্তবে স্বীকার করে না। এ প্রসঙ্গে জন স্মীথের দেয়া একটি চমকপ্রদ তথ্য উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছেন, 'ব্রিটেনের সানডে টাইমস-এর ২২ নভেম্বর, ১৯৮৪ রিপোর্টে দেখা যায়, সৌদী আরবের বাণিজ্যিক কেন্দ্রস্থল জেদ্দার মত শহরের ৫০% এর বেশি দালান-কোঠা নারীদের মালিকানাভুক্ত। তিনি আরো লিখেছেন, সৌদী আরবের মত জায়গায় যেখানে নারীদের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়, সেখানেও তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ শক্তিশালী।'[৬২]

৯. সমঝোতার মাধ্যমে নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাবে না বিষয়টি তেমন নয়। কেননা, কারো পুত্র কিংবা কন্যা সন্তানের কেউ যদি অসচ্ছল হয় এবং পিতা যদি আলোচনার মাধ্যমে পুত্র কিংবা কন্যাকে তার প্রাপ্য অংশ ছাড়াও আরো অতিরিক্ত কিছু দান করতে চান তবে তা করতে পারেন অথবা ভাই-বোনেরাও আলোচনার মাধ্যমে সম্পদ বেশি কম নিতে পারে, ইসলাম এহেন পদ্ধতিকে অস্বীকার করে না। কাজেই পুত্র কিংবা কন্যার প্রাপ্য সম্পদের বেশি কম নিয়ে প্রশ্ন তোলা নি:সন্দেহে অবান্তর। কুরআন মজীদে সমঝোতাকে প্রশংসনীয় বলা হয়েছে : 'আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়।'[৬৩]

১০. ওয়ারিসী সম্পদে নারী-পুরুষের অংশের তারতম্য তাদের মর্যাদার তারতম্য নির্দেশ করে না, বরং মর্যাদার দিক থেকে নারী-পুরুষ উভয় সমান। কেননা কুরআন মজীদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে: 'আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোন নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ।'[৬৪]

অপর এক আয়াতে আছে : 'অবশ্য মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী - এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।'[৬৫]

মোটকথা, অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বের কারণে একমাত্র মীরাস স্বত্বে কম-বেশী করা হয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরুষকে সমঅধিকার দিয়েছে। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলাম সকল ক্ষেত্রে নারীর ন্যায্য অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।

১১. ওয়ারিসী সম্পদে নারী-পুরুষের প্রাপ্য অংশে কম-বেশী নির্ধারণ করার সুপ্ত রহস্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলা অবগত। তাই তিনি বলেছেন : 'তোমাদের পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা অবগত নও। এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[৬৬]

এ আয়াত নাযিল করে অনাগতকালের ইসলাম বিদ্বেষী অথবা ইসলাম সম্পর্কে অপরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী লোকদের উহ্য প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে।

৭. বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পদে নারী অধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পদে নারীর অধিকার বিষয়টি স্বীকৃত। সংবিধানে বলা হয়েছে :

ধারা ৪২(১) : আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

ধারা ২০(১) : কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং 'প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারেও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী'- এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্যই পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

ধারা ২০(২) : 'রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক - সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।'

ধারা ১৫(খ) : কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার।

ধারা ৪০ : আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসংগত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইনসংগত কারবার বা ব্যবসা পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

ধারা ২৯(১) : প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

ধারা ২৯(২) : কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

ধারা ২৯(৩) : এই অনুচেছদের কোন কিছুই (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ধারা ৩৪(১) : সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৮. বাংলাদেশের নারী সমাজ

বাংলাদেশের ৬৩% মানুষ বাস করে দারিদ্র্যসীমার নীচে। এ পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারে উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্যের মর্যাদা বেশি। অত:পর ভবিষ্যত উপার্জনক্ষম পুত্র সন্তান, তারপর মা, দাদী এবং কন্যা সন্তানের স্থান। সুতরাং নারী সদস্য পরিবারে দরিদ্র থেকে যায়। ইসলামী শরী'য়া মতে যদিও পিতার সম্পদের অংশ ও স্বামীর নিকট থেকে দেনমোহর পাবার কথা, কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ছেলেরা মেয়ের পিতামাতার নিকট থেকে যৌতুক নিয়ে বিবাহ করছে। হিন্দু মেয়েরা যেহেতু পিতার সম্পত্তির অংশ পায় না বলে তাই তাদের বিবাহের সময় যৌতুক দেয়া নেয়া হয়ে থাকে। এই নিয়ম বর্তমানে মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়েছে এবং ব্যাপকতা পাচ্ছে। যৌতুক দিতে না পারায় দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে না। কখনো বিবাহ হলেও যৌতুক দিতে না পারায় প্রতিনিয়ত তারা নিগৃহীত হচ্ছে আবার কখনো যৌতুক আদায়ে অপারগতার কারণে হত্যার শিকার হচ্ছে।

এই অমানবিক অবস্থা উত্তরণের লক্ষে ১৯৮০ সালে যৌতুক বিরোধী আইন পাশ করা হয়। কিন্তু আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় সমস্যা দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে। ১৯৮৩ সালে Cruelty to women ordinance পাশ করা হয়, যা ১৯৮৫ সালে আইনে পরিণত হয়। এতেও অবস্থার খুব একটা উন্নতি ঘটেনি। আমরা পত্র-পত্রিকায় নারী নির্যাতনের যে চিত্র লক্ষ করি তন্মধ্যে যৌতুকের দাবি সংক্রান্ত বিষয় অন্যতম।

বাংলাদেশে যে সব বিষয় নিয়ে খুব বেশি সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, লেখালেখি হয় - এককথায় গলা ফাটিয়ে উচ্চ:স্বরে অধিকারের আওয়াজ তোলা হয় তা হ'ল, নারী বৈষম্যের শিকার, নারী প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে উপেক্ষিত কিংবা বলা হয়, নারী সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত। যে সকল মতলববাজ নারীদের ব্যাপারে এহেন প্রপাগাণ্ডা চালায় তাদের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। প্রায়শ দৈনিক পত্র-পত্রিকায় নারী নিগৃহীত হওয়ার যে চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে নিদেন পক্ষে তার ৯৯% ভাগ নারী নির্যাতনের ঘটনা তাদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। তারা নারীর অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানের নামে সম্ভ্রম হানি করে, দেনমোহর থেকে বঞ্চিত করে, যৌতুক প্রদানে বাধ্য করে। এর অন্যথা হলে তারা নারীদের জীবন সংহার করতেও দ্বিধাবোধ করে না। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে যারা কুরআন-হাদীসের বিধান সম্পর্কে সজাগ-সচেতন এবং আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতায় অবিচল আস্থাশীল তাদের দ্বারা নারী অধিকার হরণ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না বরং তারাই নারী অধিকারের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন ব্যক্তিগত জীবনে এবং নারী অধিকার সুরক্ষা করার সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সমাজের সকল ক্ষেত্রে। মোটকথা, যারা কুরআন-হাদীসের জ্ঞান রাখেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূল স. প্রদর্শিত পথে চলা নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নিয়েছেন কেবল তাদের দ্বারাই নারী অধিকার সর্বতোভাবে নিশ্চিত হতে পারে। এক্ষেত্রে নারী অধিকার সুরক্ষার পক্ষের ও বিপক্ষের শক্তিকে চিনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় নারী সমাজ মানব রূপী পশুদের দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হতেই থাকবে।

৯. উপসংহার

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র নির্ভুল পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। এতদসত্ত্বেও মানুষ কখনো অজ্ঞতা বশত আবার কখনো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ইসলামের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ফলে তারা সমাজের কিছু সংখ্যক লোককে ক্ষেপিয়ে তুলে ইসলাম বিরোধী হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এমন একটি বিষয় হচ্ছে 'সম্পদে নারীর অধিকার'। বিশেষত কুরআনের বাণী : 'এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান' (সূরা নিসা : ১১) নিয়ে। অথচ একজন নারী সকল প্রকার অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত থেকে যে কী পরিমাণ সম্পদ লাভ করে তা কি অভিযোগকারীগণ একবারের জন্যও ভেবে দেখেছেন? অথবা বলা যায়, অর্থনৈতিক সকল দায়-দায়িত্ব পুরুষের উপর থাকা সত্ত্বেও নারী দেনমোহর পাচ্ছে সে ব্যাপারে তাদের বক্তব্য কী ? এব্যাপারে কথা না বলা কি তাদের স্থূল দৃষ্টিভঙ্গি নয়? ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের লোকদের নারী অধিকারের ব্যাপারে মুসলমানদের সবক দেয়ার কি নৈতিক অধিকার আছে? তারা নিজেদের ইতিহাসের দিকে তাকালেই তাদের কুৎসিত চরিত্র বিবেকের আয়নায় দেখতে পাবেন। আর কোন মুসলিম কি ছেলেমেয়ের সম্পদের বৈষম্য বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন? তার কি জানা উচিত নয় যে, নারী অর্থনৈতিক দায়মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্র থেকে সম্পদ পাওয়ায় সে পুরুষের চেয়ে বেশি সম্পদ লাভ করে থাকে। কোন মুসলিম নামধারী ব্যক্তি এরূপ মন্তব্য করলে তার জন্য করুণা প্রকাশ ছাড়া আর কি বা করার আছে! তাদের জন্য এই দু'আই করতে হয় : 'হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য-লংঘনপ্রবণ করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের করুণা দাও, নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।'[৬৭]

নিপীড়ন-নির্যাতনের মূলোৎপাটন, অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত করার মহান ব্রত নিয়ে অনেক সংগঠন ও সংস্থা গড়ে উঠেছে এবং অদ্যাবধি তাদের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। জাতিসংঘ ৮ মার্চ নারী দিবস ঘোষণা করেছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সফলতা তো আসেইনি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর দুর্ভোগ আরো বাড়িয়েছে। মানব চিন্তা যতই শাণিত যুক্তির কষ্টিপাথরে উন্নীত হোক না কেন, আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল জ্ঞানের সহায়তা ছাড়া প্রকৃত সফলতা কখনো সম্ভব নয়। কাজেই এ পর্যায়ে আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, সম্পদে নারীর অধিকারসহ সকল প্রকার অধিকারের নিশ্চয়তা ও সুরক্ষা প্রদান করেছে ইসলাম। জীবনের সকল পর্যায়ে যদি আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী স. প্রদর্শিত বিধান মেনে চলা যায় তাহলেই নারী অধিকারসহ বিশ্বমানবতার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নতুবা মানবীয় প্রচেষ্টা মরীচিকার ন্যায় নিষ্ফল ও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তথ্যপঞ্জি

১. ড. রাওয়ান ও হামিদ সাদিক, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা (করাচী : তা: বি:), পৃ. ৩৯৬।
২. ইবনে মানযূর, লিসানুল আরাব (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৩/২০০৩), ৮ম খণ্ড, ২য় কলাম, পৃ. ৪০৩।

৩. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৫/১৯৯৫), ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৯৫।
৪. ড. মুহাম্মদ রাওয়ান ও ড. হামিদ সাদিক, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩৯৭।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. সূরা নিসা : ৮।
৬ক. মনু সংহিতার প্রণেতা মনুর কথা আমরা এখানে এজন্য আনছি যে, বর্তমান হিন্দুসমাজ মনুর বাণীর অনুসারিতার দাবিদার না হলেও আসলে তাদের সামাজিক রীতি পদ্ধতি তারই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হয়েছে।
৭. দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ১৯১১, খণ্ড ২৮, পৃ. ৭৮২।
৮. জাফর আহমাদ, মীরাসী আইন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামী আইন ও বিচার* (ঢাকা: ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, বর্ষ-২, সংখ্যা-৮, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৬), পৃ. ৮৩।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. ১৯২৫ সন, ৩৯ নং আইন।
১১. মওলানা মো: ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয (ঢাকা: আর আই এস পাব., ১৯৯৫), পৃ. ১৩৬।
১২. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ৬২।
১৩ মওলানা মো: ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৪২-৪৩।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।
১৫. ড. মাহবুবা রহমান, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ২১।
১৬. দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ১১ সংস্করণ, ১৯১১, খণ্ড ২৮, পৃ. ৭৮২।
১৭. এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা ইন্টারন্যাশনাল এডিশন, খণ্ড ২৯, পৃ. ১০৮।
১৮. ড. মুস্তফা আস-সাবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, বাংলা অনু. আকরাম ফারুক (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮), পৃ. ১৬।
১৯. সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫), পৃ. ৩২২।
২০. সূরা নাহল : ৫৮-৫৯।
২১. সূরা বনী ইসরাঈল : ৩১।

২২. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ আল-বিরুরু ওয়াস-সিলাতু ওয়াল-আদাব, অনুচ্ছেদঃ ফাযলুল ইহ্সান ইলাল বানাত (আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০), হাদীস নং ৬৬৯৫, পৃ. ১১৩৬।

২৩. হায়সামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ও মাম্বাউল ফাওয়াইদ, অধ্যায়ঃ আল-বির্র ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদঃ মা জাআ ফিল আওলাদ (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪০৮/১৯৮৮), ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

২৪. ইমাম ইবনে মাজাহ, সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ আল-আদাব, অনুচ্ছেদঃ হাক্কুল ইয়াতিম (আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০), হাদীস নং ৩৬৭৮, পৃ. ২৬৯৭।

২৫. সূরা আলে ইমরান : ৩৫-৩৬।

২৬. সূরা নিসা : ১৩-১৪।

২৭. ইমাম তিরমিযী, জামে আত-তিরমিযী, অধ্যায়ঃ আল-ফারাইয, অনুচ্ছেদঃ মা জাআ ফী তা'লীমিল ফারাইয (আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০),হাদীস নং ২০৯১, পৃ. ১৮৬০।

২৮. জাফর আহমাদ, মীরাসী আইন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *ইসলামী আইন ও বিচার* (প্রাগুক্ত), পৃ. ৭৬।

২৯. ড. মুস্তফা আস সাবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, বাংলা অনু. আকরাম ফারুক (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩১।

৩০. সূরা বাকারা : ২৮২।

৩১. সূরা নিসা : ৩২ ।

৩২. ইবনুল আসীর, উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা (কায়রোঃ আল-মাকতাবা আত-তাওফিকিয়্যা, তাঃ বিঃ), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৪।

৩৩. প্রাগুক্ত।

৩৪. আল-কাসানী, বাদাইউস সানাই ফী তারতীবিশ শারাই (বৈরূতঃ দারু ইহয়াউত তুরাস আল-আরাবী, ১৪১৯/১৯৯৮), ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৪৯৭-৯৮।

৩৫. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩৩৪-৩৪৫।

৩৬. ইবনে আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার (বৈরূতঃ তাঃ বিঃ), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭১।

৩৭. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ আত-তালাক, অনুচ্ছেদঃ জাওয়াজু খুরুজিল মু'তাদ্দাতিল বায়িন... (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ৩৭২১, পৃ.৯৩৩।

৩৮. ইবনে সাদ, আত তাবাকাত (বৈরূতঃ দারু সাদির, ১৩৭৬/১৯৫৫), ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১২।

৩৯. ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আত-তাফসীর, অনুচ্ছেদঃ কাওলুহু লা তাদখুলু বাইতান নাবিয়্যি ...(আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০), হাদীস নং ৪৭৯০, পৃ. ৪০৭।
৪০. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, বাংলা অনু. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ১২৫।
৪১. ইবনে হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়িযিস সাহাবা (কায়রোঃ তাঃ বিঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১০।
৪২. ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়ঃ আল-ওয়াসাআ, অনুচ্ছেদঃ আল-ওয়াসিয়্যাতু বিস-সুলুস (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ২৭৪৪, পৃ. ২২০।
৪৩. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ আয-যাকাত, অনুচ্ছেদঃ আজরুল খাযিনিল আমীন ওয়াল মারআতি ইযা তাসাদ্দাকাত ... (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ২৩৭০, পৃ. ৮৪০।
৪৪. ইমাম আবু দাউদ, সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আয-যাকাত, অনুচ্ছেদঃ আল-মার'আতু তাসাদ্দাকা মিন বাইতি যাওজিহা (আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০), হাদীস নং ১৬৮৬, পৃ. ১৩৪৮।
৪৫. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ আয-যাকাত, অনুচ্ছেদঃ ফাযলুন নাককাতি 'আলাল ই'আল ... (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ৩১১, পৃ. ৮৩৫।
৪৬. ইমাম শাওকানী, নাইলুল আওতার (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪০৪/১৯৮৩), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৬।
৪৭. সূরা নিসা : ২৪।
৪৮. সূরা নিসা : ২০।
৪৯. সূরা বাকারা : ২২৯।
৫০. সূরা নিসা : ৪।
৫১. ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়ঃ আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদঃ আশ-শুরুত ফিন-নিকাহ (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ৫১৫১, পৃ. ৪৫৫-৫৬।
৫২. হায়সামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ও মাম্বাউল ফাওয়াইদ, অধ্যায়ঃ আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদঃ ফী মান নাওয়া আ-ল্লা ইউয়াদ্দি সিদাকা ইমরাআতাহু (প্রাগুক্ত), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৪।
৫৩. সূরা নিসা : ১১।
৫৪. সূরা নিসা : ৩৪।
৫৫. সূরা বাকারা : ২৩৩।
৫৬. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ আয-যাকাত, অনুচ্ছেদঃ ফাযলুন-নাফকাতি ওয়াস-সাদাকাহ ... (প্রাগুক্ত), হাদীস নং ২৩২২, পৃ. ৮৩৬।

৫৭. সূরা নিসা : ৪।

৫৮. সূরা বাকারা : ৮৫।

৫৯. সূরা আহযাব : ৩৬।

৬০. মোহাম্মদ আজরফ, জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১), পৃ. ৯৭।

৬১. ইউ. এ. বি. রাজিয়া আকতার বানু, সংবিধানে ও ধর্মে বাংলাদেশে মুসলিম নারীর অধিকার ও মর্যাদা ঃ একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা (ঢাকা: দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৪), পৃ. ৫৬।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

৬৩. সূরা নিসা : ১২৮।

৬৪. সূরা আলে ইমরান : ১৯৫।

৬৫. সূরা আহযাব : ৩৫।

৬৬. সূরা নিসা : ১১।

৬৭. সূরা আলে ইমরান : ৮।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা : ২৯-৪৪

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সমস্যাবলী : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান

প্রারম্ভিকা

ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট ও শর্ত হলো, এর সকল কার্যক্রম সুদমুক্ত হতে হবে। সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট আয়াত নাযিল হয়েছে এবং পাঁচটি পর্যায়ে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের মাধ্যমে সুদকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করে তা বর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক সুদ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, 'অতপর যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না করো তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হও'[১] সুদকে একটি মারাত্মক প্রতারণা, জুলুমের হাতিয়ার এবং মানবতার বিপদ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। সুদের লেনদেনকে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং সুদ প্রত্যাখ্যান না করাকে আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সামিল বলা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছাড়া অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা অসম্ভব। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদ হলো চালিকাশক্তি। পাপাচারের পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের কাছে যেমন গুরুতর পাপও কোন পাপ বলে মনে হয় না তেমনি আমাদের সমাজেও সুদের মত একটি মারাত্মক পাপকে অনেকেই আর পাপ বলে মনে করেন না। এটা এখন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার কিছু অজ্ঞ লোক ব্যাংকের প্রচলিত সুদকে ইসলাম ঘোষিত সুদ ভাবতে নারাজ।

সাধারণ মানুষকে এই সুদের পাপ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার আলোকে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় আমনত গ্রহণ ও বিনিয়োগের সকল কার্যক্রম অবশ্যই সুদমুক্ত হতে হবে। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম ইসলামী অর্থনীতির সুফল জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়ার মহান উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে। কল্যাণমূলক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মহান উদ্দেশ্যে দুই দশক আগে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং বাংলাদেশে সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছে। তবে ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে এর কার্যক্রম পরিচালনায় এখনও কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আলোচ্য নিবন্ধে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর কিছু সমস্যা এবং তার আলোকে কিছু সুপারিশ পেশ করা হবে। এর আগে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভের প্রয়োজন।

লেখক : একটি সরকারি কলেজের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক।

ইসলামী ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংক, ব্যাংকিং জগতে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়নের মহান উদ্দেশ্যে পরিচালিত। যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা কুরআন-হাদীস ও ইসলামী শরীয়তের অনুশাসন অনুযায়ী পরিচালিত হয়, তাকে ইসলামী ব্যাংক বলা হয়।

OIC (Organization of Islamic Conferences) সচিবালয় ইসলামী ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য সংগা নির্ধারণ করেছে, 'ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার মৌলিক বিধান, নীতিমালা, বৈশিষ্ট ও কর্মপদ্ধতিতে ইসলামী শরীয়তের মৌল নীতিমালা অনুসরণের সুস্পষ্ট অংগীকার থাকবে এবং যার সমুদয় কার্যক্রম ও লেনদেন হবে সুদের লেনদেন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।' (Islamic Bank is a financial instution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations)[২]

ইসলামী ব্যাংকের উপরোক্ত সংগাটি ১৯৭৮ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক অপরাপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত সকল ইসলামী ব্যাংক তাদের কার্যক্রমের মৌল নির্দেশিকা হিসাবে এ সংগা গ্রহণ করেছে।

মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং আইন ১৯৮৩ ইসলামী ব্যাংকের যে সংগা প্রদান করেছে তা নিম্নরূপ : 'ইসলামী ব্যাংক এমন একটি কোম্পানী যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা করে এবং যার একটি বৈধ লাইসেন্স আছে। আর ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা হচ্ছে এমন এক ব্যবসা যার সকল কর্মকাণ্ডে কোথাও এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করে না।' (Islamic Bank means any company which carries on Islamic Banking business having a legal license and Islamic banking business is a business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the religion of Islam)[৩]

OIC এবং মালয়েশিয়ার ব্যাংকিং আইনে প্রদত্ত সংগার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারণা

৫০-এর দশকে ইসলামী ব্যাংকিং ছিল শুধু গবেষণার বিষয়বস্তু। ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণ তাদের বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদের ধারণা পেশ করেন। ৬০-এর দশকে এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় এবং ৭০-এর দশকে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ জোরদার হতে

থাকে। ৮০ ও ৯০ দশকে ইসলামী ব্যাংকিং সুসংহত হয়। ১৯৬৩ সালে মিসরের মিতগামারে একটি সফল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১৯৭২ সালে নাসের সোস্যাল ব্যাংক, ১৯৭৫ সালে দুবাই ইসলামী ব্যাংক, ১৯৭৭ সালে ইসলামী ডেভলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকরী পরিবর্তন সাধিত হয়। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার প্রায় ৫০টি দেশে এ পর্যন্ত ৩ শতাধিক ইসলামী ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, আর্জেন্টিনা, ডেনমার্ক, লুকসেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড ও ভারতের মতো অমুসলিম দেশগুলোতেও আজ ইসলামী ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।[৪]

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাস বেশি পুরাতন নয়। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে এখানকার মানুষের ইসলামী আদর্শের প্রতি জোরালো মনোভাব রয়েছে। ইসলামী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবন ধারায় ইসলামের প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করে। সুদ যেহেতু সুস্পষ্ট হারাম সেহেতু এদেশের মুসলমানরা সুদ পরিহার করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১৯৭৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক সনদে স্বাক্ষর করে এবং বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অংগীকার ব্যক্ত করা হয়। ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে মক্কা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত ওআইসি-এর ৩য় শীর্ষ সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, 'নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের উচিত একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা।'[৫]

এই ঘোষণার পর দেশের গোটা ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ সম্ভব না হলেও ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করার পথ সুগম হয়। দেশে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করার ক্ষেত্রে দুটি পেশাজীবী সংস্থা ইসলামিক ইকোনোমিক রিসার্চ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংকের এসোসিয়েশন (বিআইবিএ) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এরপর বিভিন্ন পথ পরিক্রমার মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থা আই.ডি.বি. ও সৌদি আরবের ক'জন প্রখ্যাত ব্যক্তির সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ দেশের প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর আবির্ভাব ঘটে।[৬] এরপর ১৯৮৭ সালে আল বারাকা ব্যাংক (বর্তমানে দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক) ইসলামী ব্যাংকিং শুরু করে।[৭] ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এবং ওআইসি এর সহযোগিতায় সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮] ১৯৯৭ সালে বিদেশী ইসলামী ব্যাংক হিসেবে সামিল ব্যাংক অব বাহরাইন বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।[৯] ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং জগতে সর্বশেষ সংস্করণ এক্সিম ব্যাংক লিঃ।[১০]

এছাড়া কয়েকটি সুদ ভিত্তিক ব্যাংকও এদের বিভিন্ন শাখায় স্বতন্ত্র ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে, যেমন প্রাইম ব্যাংক লিঃ, ঢাকা ব্যাংক লিঃ, সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, দি সিটি ব্যাংক লিঃ. প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ, যমুনা ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সমস্যা

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সূচনাকাল থেকেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসছে। বর্তমান সময়ে বাংকগুলো যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুপারভাইজিং কাঠামোর অভাব : বাংলাদেশে ৭টি পুর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালাচ্ছে, তার মধ্যে ৬টি দেশী এবং ১টি বিদেশী। প্রত্যেকটি ইসলামী ব্যাংকেরই শরীয়াহ কাউন্সিল বা শরীয়াহ বোর্ড রয়েছে এবং বর্তমানে সবগুলো ইসলামী ব্যাংকের জন্য একটি সেন্ট্রাল শরীয়াহ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শরীয়াহ প্রতিপালনে এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রযাত্রায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন কেন্দ্রীয় শরীয়াহ কাউন্সিল নেই। ফলে ইসলামী ব্যাংকগুলো আসলেই শরীয়াহ প্রতিপালন করছে কিনা সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন প্রত্যক্ষ সুপারভাইজিং ব্যবস্থা/কাঠামো নেই। তাই বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি কেন্দ্রীয় শরীয়াহ কাউন্সিল থাকা অত্যন্ত জরুরী।

২. প্রয়োজনীয় আইন কাঠামোর অভাব : বাংলাদেশের ব্যাংকিং আইন সুদী ব্যাংকের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। বৃটিশ আমলে তৈরি সুদমুখী আইন ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের অনেক পরে মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হলেও প্রথমেই তারা এ বিশেষ ধরনের ব্যাংকিং পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রস্তুত করেছে। পাকিস্তান, ইরান, সুদান, বাহরাইন, কুয়েত ও অন্যান্য মুসলিম দেশে যেখানে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেখানে প্রয়োজনীয় আইন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ইরান ও সুদানের পুরো ব্যাংক ব্যবস্থাকেই ইসলামীকরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে অংশীদারীর ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে হলেও ডেবিট-ক্রেডিট ভিত্তিতে চুক্তি করতে হচ্ছে এবং ডিফল্ট কালচারের ক্ষেত্রে মামলা করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আর আইনের দীর্ঘসূত্রিতা ইসলামী ব্যাংকের জন্য আর একটি বড় সমস্যা। কারণ কোন মামলার রায় ৫ বছর পর হলেও সুদী ব্যাংক পুরো সময়ের জন্য সুদ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ অনুযায়ী সুদ গ্রহণ অথবা মালের দাম বৃদ্ধি করতে পারে না বলে পুরো সময়ের জন্যই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক কাঠামোর সাথে প্রয়োজনীয় আইন কাঠামোর সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকসমূহ সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত অংশীদারী আইন একটি বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই আইনের ভাষ্যমতে একজন অংশীদার তার কর্মকাণ্ড অপর অংশীদার বা সকল অংশীদারকে দায়বদ্ধ

করতে পারবে। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংক কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারী চুক্তিবদ্ধ হলে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বহীন বা উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূল বিনিয়োগ মুড অংশীদারী ব্যবসা অগ্রসর হতে পারছে না।

৩. বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ঝুঁকিমুক্ত থাকার প্রবণতা : ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যই ছিল সুদের পরিবর্তে ব্যবসাভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলন করা। আর ব্যবসা পদ্ধতিতে ঝুঁকি একটি অন্যতম শর্ত। একজন ব্যবসায়ী সকাল বেলা এই ঝুঁকি নিয়েই মাল ক্রয় করেন যে, তার সব মাল বিক্রি নাও হতে পারে। আবার কিছু জিনিস পঁচা বা নষ্ট থাকতে পারে। ব্যবসার একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্টই হলো লাভ অথবা লোকসানের ঝুঁকি থাকবে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিনিয়োগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট হলো Profit-loss sharing ব্যবস্থা। সুদী ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকিং-এর মৌলিক পার্থক্যই হলো সুদী ব্যাংক ঝুঁকিমুক্ত পূর্ব-নির্ধারিত সুদ হিসাব করে বিনিয়োগ করে, আর ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা অথবা মুশারাকা নীতিতে চুক্তিবদ্ধ হয় লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে। এখন ইসলামী ব্যাংকগুলো শুধু বাই-মুরাবাহা ধরনের মার্ক-আপ নীতির আলোকে ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ করতে পারে। কিন্তু এতে কোনভাবে শরীয়াহ আইন প্রতিপালিত হলেও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পরিধি সংকুচিত থাকবে। তাই ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ কম হওয়া বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার একটি অন্যতম সমস্যা। মুশারাকা (অংশীদারী) ব্যবসায়ে অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এতে মুদ্রাস্ফীতির কোন সুযোগ থাকে না। কারণ উৎপাদনের সাথে তা সরাসরি যুক্ত থাকে। মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ হলো টাকার ক্রমবৃদ্ধির সাথে উৎপাদনের ক্রমবৃদ্ধির সমন্বয় না থাকা। মুদারাবা কারবারে সরবরাহকারী ব্যাংকের অবস্থান হলো হযরত খাদীজা রা. স্থানীয়, আর মুদারাবা হলো তাঁর ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. কার্যক্রম স্থানীয়-এর। রসূলুল্লাহ স.-ই প্রথম মুদারাবা পদ্ধতিতে হযরত খাদীজা রা.-এর সাথে ব্যবসা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে সৎ উদ্যোক্তা পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। মুদারাবা ব্যবসায় মুদারিবকে অবশ্যই সৎ, দক্ষ ও আমানতদার হতে হয়। এরূপ আমানতদারের সংকটেই মুদারাবা বা মুশারাকা (অংশীদারী) ব্যবসায়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সফলভাবে বিনিয়োগ করতে পারছে না। অনেক ব্যবসায়ী আয়কর ফাঁকি দেয়ার জন্য ২টি খাতা সংরক্ষণ করেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকও তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে ১৯৯৭-৯৮ সালে আয়কর ছিল ৩৫% এবং ব্যাংক-বীমার ক্ষেত্রে ৪০%। সঠিক লাভ দেখালে ব্যাংক ও সরকারকে অধিক হারে কর দিতে হবে বলে তারা দু'পক্ষকেই ঠকিয়ে থাকে।

মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে অর্থ সরবরাহ করতে না পারায় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কর্ণধাররাও খুশি নন। বছর কয়েক আগে একটি সেমিনারে একটি ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রকাশ্যে বলেছেন, 'সত্যিকার ইসলামী ব্যাংক বলতে যা বুঝায় আমরা তা করছে পারছি না। আমরা এক ধরনের জোড়াতালি দিচ্ছি।'[১১]

ইসলামী ব্যাংকসমূহ অর্থ জমাকারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করলেও সম্পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে পারছে না। ফলে ইসলামী ব্যাংকিং-এর স্বপ্নদ্রষ্টারা হতাশা ব্যক্ত করেন এবং ইসলামী ব্যাংক ব্যবসায়ীদের নীতি চ্যুতির সমালোচনা করেন। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং-এর পথিকৃৎ ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী তার 'Islamic Banking: Theory and Practic' শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে যে কঠোর মন্তব্য করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে : 'We can not claim, for an alternative to interest system which is not based on sharing, the superiority which could be claimed on the basis of profit-sharing. What is worse, if the alternative in practice is built around predetermined rates of return to investible funds supplied to finance trade, industry, agriculture etc. it will be exposed to the same criticism which was directed to interest as a fixed charge on capital. It so happens that the returns to finance provided in the modes of finance based on murabaha, bai' salam, leasing and lending with a service charge, are all predetemined like interest. Some of these modes of finance are said to be exposed to some risk, but all these risks are insurable and are actully injured against. The uncertainty to which the business being so financed is exposed is, Fully passed over to the other party. A finnacial system bulit sololy around these mode of financing can hardly claim superiority over an interest based system on grounds of equity, efficiency, stablity and growth.' অর্থাৎ বন্টনভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সুদের এমন কোন বিকল্প ব্যবস্থার জন্য আমরা এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারি না যা একটি মুনাফা ভিত্তিক ব্যবস্থার জন্য দাবি করা যেতে পারে। সবচেয়ে খারাপ কথা হলো সুদের এই বিকল্প ব্যবস্থাটি যদি কার্যক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় নিয়োজিত অর্থের জন্য পূর্বনির্ধারিত হারে মুনাফা আদায় করে তবে মূলধনের উপর নির্দিষ্ট ধার্য হিসেবে সুদের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করা হয়ে থাকে এই বিকল্প ব্যবস্থাটিও সেই একই সমালোচনার সম্মুখীন হবে। বাস্তবে যা ঘটে তা হচ্ছে, মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, ইজারা ও সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ঋণদান প্রভৃতি পদ্ধতিতে অর্থায়নের বিপরীতে প্রাপ্য পারিতোষিক (মুনাফা) সুদের মতই পূর্ব নির্ধারিত

থেকে যাচ্ছে। এই সব অর্থায়ন পদ্ধতির কোন একটির ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ ঝুঁকি রয়েছে বলে দাবি করা হয় এবং এই সকল ঝুঁকিও বীমাযোগ এবং সেগুলো কার্যত বীমা করা হচ্ছেও। (ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক) উপরোক্ত পদ্ধতিতে যে কারবারে অর্থায়ন করা হচ্ছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি (এভাবে সম্পূর্ণরূপে অন্য পক্ষের (বীমা কোম্পানীর) উপর বর্তাচ্ছে। সুতরাং এই ধরনের (পূর্ব নির্ধারিত মুনাফায়) অর্থায়ন পদ্ধতির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল কোন অর্থ ব্যবস্থা সমতা, দক্ষতা, স্থিরতা ও প্রবৃদ্ধির বিবেচনা কোনক্রমেই সুদী ব্যবস্থার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না।[১২]

৪. ইসলামপ্রিয় মানুষের ব্যবসাবিমুখতা : ইসলামী ব্যাংকসমূহের সঠিক ধারায় পরিচালিত করতে হলে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করতে Profit-loss sharing পলিসিতে অধিক হারে বিনিয়োগ করতে হবে। এ জন্য সৎ উদ্যোক্তার কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে দেশের সৎ, বিবেকবান ও ধর্মভিরু মুসলমানদের এগিয়ে আসতে হবে। তারা একবার ব্যাংকের বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী ব্যাংকিং-এর একান্তেই ইসলামী পদ্ধতিতে অধিক হারে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবে।

আমাদের দেশের ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পবিমুখ। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবর্তে অন্যের অধীনে চাকরি করতে অধিক পছন্দ করেন। আর আলেম সমাজ শুধু মসজিদ-মাদরাসা আঁকড়ে ধরে থাকতে চান। তাই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এক বিশেষ শ্রেণীর লোকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার জন্য ইসলামী মূল্যবোধে জাগ্রত লোকদের অধিকহারে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার দিকে এগিয়ে আসতে হবে। ইমাম আবু হানিফা র. একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ছিলেন। কুফা, খোরাসান ও মিসরে তাঁর বস্ত্র কারখানা ছিল। অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন থাকার কারণে তিনি কখনও সত্য বলতে ভয় পেতেন না। তিনি নির্ভয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন। আশারা মুবাশশারা বা দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবীর মধ্যে হযরত আলী রা. ছাড়া সকলেই সক্রিয় ব্যবসায়ী ছিলেন।[১৩]

৫. আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং লেনদেনে সমস্যা : আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকগুলোর Account থাকতে হয়। এসব Account Nastro Account হিসেবে পরিচিত। অমুসলিম দেশের ব্যাংকগুলোর আয়ের উৎস হলো সুদ। তাই বিদেশী বিভিন্ন সুদী ব্যাংকের সাথে লেন-দেনের মাধ্যমে যে বিশাল অংকের অর্থ আসে তা ইসলামী ব্যাংকগুলো নিজেদের হালাল আয়ের সাথে সংযুক্ত করতে পারে না। তাই আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগ কম পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিশ্বায়নে এটা একটা বড় সমস্যা।

৬. ইসলামী মানি মার্কেটের অভাব : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর একটি বড় সমস্যা হলো পর্যাপ্ত ইসলামী মানি মার্কেটের অভাব। ইসলামী নীতির ভিত্তিতে সরকার অনুমোদিত সুদমুক্ত

কোন বন্ড বা সিকিউরিটি না থাকায় ইসলামী ব্যাংক এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারতো না। তাই তাদের পুরো টাকাই নগদ হিসেবে জমা রাখতে হতো। পরবর্তীতে ইসলামী ব্যাংকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকের জন্য ৬% নির্ধারিত করে দেয়। অর্থাৎ যেখানে অন্যান্য সুদী ব্যাংককে নগদ এবং সিকিউরিটিজ মিলিয়ে ১২% জমা রাখতে হতো সেখানে ইসলামী ব্যাংক তারল্য আকারেই (নগদ) ৬% রাখতো কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের কোন অলস টাকা কোন বন্ড বা সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগ করতে পারত না।[১৪] এরপর ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি সহানুভূতিশীল বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি ইসলামী বন্ড বাজারে ছেড়েছে, যার নাম G.I.I.B. (Government Islamic Investment Bond)।[১৫]

৭. স্বল্প মেয়াদী অর্থ বিনিয়োগের সুযোগের অভাব : স্বল্প মেয়াদের জন্য বিনিয়োগের কোন সুযোগ এখনও ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য নেই। কিন্তু স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগে লাভের পরিমাণ সব সময় বেশি থাকে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এখন পর্যন্ত স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগের কোন লাভজনক কৌশল উদ্ভাবন করতে পারেনি।

৮. দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ এবং ঋণখেলাপী সমস্যা : দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে ব্যাংকের লাভ সব সময় কম থাকে। আবার দীর্ঘদিন অর্থ আটকে থাকায় নতুন প্রকল্পে অর্থায়নে সমস্যা হয়। তবে তার চেয়েও বড় সমস্যা, যদি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে বিনিয়োগ গ্রহীতা ঋণখেলাপী হয়। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অস্তিত্বের জন্য ঋণখেলাপী বা Defalt Culture একটি বড় হুমকি। বাংলাদেশে ব্যাংকিং আইনের জটিলতার কারণে এমনিতেই ঋণখেলাপীদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনায় অনেক সমস্যা। তারপর এদেশে মামলার রায় হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এই সময়ের জন্য অন্যান্য সুদী ব্যাংক লাভবান হলেও ইসলামী ব্যাংক অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোন অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ ইসলামী শরীয়ায় সময়ের কোন বিক্রয় মূল্য নেই। এক্ষেত্রে ঋণখেলাপী প্রবণতা রোধ করার জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর শরীয়াহ কাউন্সিলের সাবেক সদস্য সচিব মরহুম মওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী বিদেশের বিভিন্ন ব্যাংক, বিশেষ করে দার আলমাল আল-ইসলামীর[১৬] সাথে যোগাযোগ করে কুরআন-সুন্নাহসহ ফকীহদের মতামত ঘেটে নিরপেক্ষ রিভিউ কমিটির মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত খেলাপী গ্রাহকদের বিরুদ্ধে জরিমানা ধার্য করার ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। কিন্তু সমস্যা হলো জরিমানা থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংকের মূল আয়ের সাথে সংযুক্ত করা যায় না। তাই দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে ডিফল্ট কালচার বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অস্তিত্বের জন্য একটি বিরাট হুমকি।

৯. সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্য আর একটি বড় সমস্যা হলো এর সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা। অথচ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানই সামনে এগুতে পারে না। সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান বলতে এখানে বুঝায় বীমা কোম্পানী, অডিট, সুপারভাইজিং এজেন্ট, কালেকশন এজেন্ট, রেটিং প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

বাংলাদেশে ইসলামী বীমা কোম্পানী গড়ে উঠলেও প্রয়োজনীয় আইন কাঠামোর অভাবে সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ, অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ও সচেতন গ্রাহকদের সহায়তায় কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি।

১০. ইসলামী ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক সমন্বয়ের অভাব : বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে সহযোগিতামূলক অবস্থার পরিবর্তে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বিরাজ করছে। প্রতিযোগিতার সাথে সাথে সহযোগিতার দৃঢ় বন্ধন থাকলে ইসলামী ব্যাংকিং আরো অগ্রসর হতে পারত। ইসলামী ব্যাংকসমূহ Cal money-এর ব্যবসা করতে পারে না। তাই লিকুইডিটির সমস্যা হলে তাদের সহায়তার কেউ থাকে না। এক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় থাকলে এবং নিজেদের মধ্যে করজে হাসানার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে সকলেরই লাভবান হবার সুযোগ থাকবে। এছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা থাকলে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে। যৌথ বিনিয়োগ, যৌথ প্রকল্প সনাক্তকরণ, উন্নয়ন ও স্থাপন, ফতওয়া ও শরীয়তের ব্যাপারে মতবিনিময়, ইসলামী অর্থ বাজারের উন্নয়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে আন্ত-ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তা বিনিময় কার্যক্রম।

১১. সুদ ও ব্যবসাকে একই পর্যায়ভুক্ত করা : সুদ ও ব্যবসা নিয়ে এখনও আমাদের সমাজে বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকেই প্রচলিত ব্যাংকের সুদ ও ব্যবসা ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং বিনিয়োগকে এক করে দেখেন। কেউ কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, ইসলামী ব্যাংকও সুদ খায়, তবে ব্যবসার লেবাস পরিয়ে। কিন্তু সুদ ও ব্যবসা কোনক্রমেই এক হতে পারে না। আল্লাহ একটি পরিষ্কারভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং অপরটিকে হালাল করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, 'অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।'[১৭]

সুদ হলো অর্থঋণের উপর পূর্বনির্ধারিত অতিরিক্ত অংশ, আর ব্যবসা হলো আয় থেকে ব্যয় বাদ দেয়ার পর প্রাপ্ত অবশিষ্টাংশ। ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিরুদ্ধে সুদ ও ব্যবসা বিষয়ক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ফায়দা গ্রহণ করার চেষ্টা করে একটি স্বার্থান্বেষী মহল। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর তেমন কোন উদ্যোগ নেই। কিছু লিফলেট ছাপানো হয়েছে তবে তা সুদী প্রচারণার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নয়।

১২. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রচারণার অভাব : সুদী ব্যাংক যেভাবে সুদের প্রচারণা চালাচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সে রকম প্রচারণা তেমন হচ্ছে না। মানুষ যদি ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না পায় তাহলে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে তারা কিভাবে আকৃষ্ট হবে? এছাড়া আমরা দেখি অন্যান্য বেসরকারি সুদী ব্যাংকের মার্কেটিং বিভাগে সেলস অফিসার থাকে। তারা বিভিন্ন জায়গায় তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পক্ষে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে ব্যাংকের জমা সংগ্রহ করে। এরাও সুযোগ মতো ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে এ ধরনের মার্কেটিং তৎপরতা থাকলেও তা জোরালো নয়। অথচ ইসলামের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে

প্রথমেই গ্রাহককে অবহিত করতে পারলে এবং সুদের কুফল ও ইসলামী ব্যাংক কিভাবে সুদকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে সে বিষয়ে গ্রাহক ব্যাংকে আসার আগেই জানতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান প্রথমেই করা যায়।

১৩. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব : বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগে ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখে 'ইসলামী অর্থনীতি সেল' গঠন করা হয়েছিল। সেখান থেকে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে গবেষণা হওয়ার কথা। সেখান থেকে এখন পর্যন্ত প্রণিধানযোগ্য কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী (IBTRA) এবং ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো এ ক্ষেত্রে কিছু কাজ করলেও তা অপ্রতুল।

১৪. দক্ষ জনশক্তির অভাব : বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনীতি ব্যাংকিং ফিন্যান্স সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক জ্ঞানার্জনের তেমন কোন সুযোগ নেই। এখানকার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে এই বিষয়ে কোন কোর্স চালু করার পরিবর্তে বরং এক শ্রেণীর শিক্ষক এর বিরোধিতা করে আসছেন। অথচ ইসলাম-বিরোধী পাশ্চাত্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সম্পর্কে কোর্স আছে। যারা ইসলামী স্টাডিজ নিয়ে লেখা-পড়া করে তারা কেবলি ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে প্রচ্ছন্ন ধারণ লাভ করতে পারে। ফলে প্রতি বছর লেখা-পড়া শেষ করে যারা ইসলামী ব্যাংকিং পেশায় আত্মনিয়োগ করে, তাদের এ বিষয়ে পূর্বজ্ঞান তেমন থাকে না। ফলে অদক্ষ জনশক্তি নিয়েই ব্যাংকগুলোকে কার্যক্রম শুরু করতে হয়। এটা নিঃসন্দেহে উন্নয়নশীল কোন ইসলামী ব্যাংকের জন্য সমস্যা।

১৫. প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের স্বল্পতা : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমী রয়েছে, এর মধ্যে IBTRA উল্লেখযোগ্য। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এখনও তা অপ্রতুল। বিভিন্ন সুদী ব্যাংক যারা ইসলামী কনসেপ্টের দিকে এগিয়ে আসতে চাচ্ছে তাদের প্রশিক্ষণদানের দায়িত্ব বর্তমান ইসলামী ব্যাংকগুলোর নিতে হবে।

১৬. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে অপপ্রচার এবং বিপরীতমুখী স্রোত : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সূচনা থেকেই এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলে আসছে। এ বিষয়ে সুদী ব্যাংকগুলোর ভূমিকাকে ছোট করে দেখা যাবে না। অপপ্রচারকারীরা সব সময় গ্রাহকদের বুঝাবার চেষ্টা করে, ইসলামী ব্যাংক সুদকে ব্যবসার লেবাস পরিয়ে একটু ঘুরিয়ে খায়, আসলে সুদ ও মুনাফা একই জিনিস। কিন্তু কোনভাবেই সুদ ও মুনাফা এক হতে পারে না। যেহেতু আল্লাহ একটিকে হারাম এবং অপরটিকে হালাল করেছেন। তবে এসব অপপ্রচার ইসলামী ব্যাংকিং এর অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করতে পারেনি। ইসলামী ব্যাংকসমূহকে সকল বিতর্কের উর্ধে রাখার জন্য এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আরও সতর্ক হতে হবে এবং বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক দলের প্রভাব-মুক্ত থেকে স্বচ্ছন্দে চলতে দিতে হবে।

১৭. ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি : ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল শোষণমুক্ত ইনসাফপূর্ণ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী ব্যাংক একটি আদর্শিক ব্যাংক, তাই

অন্যান্য মুনাফালোভী ব্যাংক থেকে এর পার্থক্য থাকতেই হবে। ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত রেখে একে ব্যবসার কথা চিন্তা করতে হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে 'ব্যবসা সফল ব্যাংক হিসেবেই ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচয় বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। এর ফলে আদর্শচ্যুত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতি বছরই ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শাখার ম্যানেজারদের একটা Profit Achievement টার্গেট নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। আর তাদের সেই টার্গেটের পিছনে দৌড়াতে গিয়ে অনেক সময় শরীয়াহ প্রতিপালনে বিচ্যুতি ঘটতে পারে। কারণ টার্গেট এসিভমেন্টের মধ্যেই নিহত রয়েছে তাদের প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট, ইনসেনটিভ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা। ফলে শরীয়াহকে অনুসরণ করার তেমন নিষ্ঠা তাদের থাকে না। এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত' কায়েম হবে না। তাতে একটি পদ্ধতি কষ্ট করে ইসলামের নামে চালানো হবে বটে তবে তার ফল হবে সুদের মতই। ইসলামী ব্যাংকের জন্য এরকম পরিস্থিতি কখনই কাম্য নয়। ইসলামী আদর্শের কথা বলে আমরা যদি সেই আদর্শকে ধরে রাখতে না পারি তবে আল্লাহ ও তার রসূল স. কিছুতেই আমাদের ক্ষমা করবেন না। ব্যাংকের অবশ্যই টার্গেট থাকবে, তবে তা ব্যাংকারদের যেন শরীয়াহ আইন লংঘনের দিকে না নিয়ে যায়, সেদিকে ব্যাংক ম্যানেজমেন্টকে লক্ষ রাখতে হবে।

১৮. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে ব্যবসায়ীদের অজ্ঞতা : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ ব্যাংকিং ক্ষেত্রে টোটাল ডিপোজিটের মাত্র ৫% এবং ইনভেস্টমেন্টের ৪% নিয়ন্ত্রণ করে।[১৮] বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রযাত্রা আরো বেগবান হতো যদি ব্যবসায়ীদের মাঝে ইসলাম বিষয়ক চিন্তা চেতনাকে প্রসারিত করা যেত। তাদের সুদের কুফল, ইসলামী ব্যাংকিং-এর কর্মপদ্ধতি এবং সুদমুক্ত থাকার কর্মপন্থা সম্পর্কে অবহিত করতে পারলে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম আরো ব্যাপক হতো। ব্যবসায়ীদের চাপেই সুদী ব্যাংকগুলো ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার দিকে ফিরে আসতে বাধ্য হতো।

১৯. সৎ ও যোগ্য ব্যবসায়ীর অভাব : সৎ ও যোগ্য ব্যবসায়ীর অভাবে ইসলামী ব্যাংক তার মৌলিক উৎসগুলোতে অধিক হারে বিনিয়োগ করতে পারছে না। ইসলামী ব্যাংকিং সম্পূর্ণ সফল করতে হলে সৎ ও যোগ্য ব্যবসায়ীর কোন বিকল্প নেই। তারা সৎভাবে ব্যবসা পরিচালনা করবে এবং লাভ-লোকসানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের সাথে অংশীদার হবে।

২০. ডকুমেন্টেশন জটিলতা : ইসলামী ব্যাংকে হিসাব খুলতে এবং বিনিয়োগ নিতে অনেক কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট দাখিল করতে হয়। ফলে কখনও কখনও গ্রাহককে যথেষ্ট হয়রানি ও বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। এসব অহেতুক ডকুমেন্টেশন বিড়ম্বনা থেকে গ্রাহকদের কতটুকু অব্যাহতি দেয়া যায় সে বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে চিন্তা করতে হবে।

২১. নগদ অর্থ ঋণ : ইসলামী ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ ঋণ নেয়ার সুযোগ কম। একমাত্র কর্জে হাসানা বা ইস্তিসনা 'পদ্ধতিতে নগদ অর্থ ঋণ নেয়া যায়। কিন্তু অর্থ ফেরৎ নেয়ার সময় কোন

অতিরিক্ত নেয়া যায় না বিধায় (নিলে তা সুদ হবে) ইসলামী ব্যাংক নগদ অর্থ ঋণ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। গ্রাহকরা যে ইসলামী ব্যাংক থেকে শুধু পণ্য কিনবে এমন ধারণা ঠিক নয়। অনেক সময় গ্রাহকদের নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে কর্জে হাসানা ভিত্তিক অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ ইসলামী ব্যাংকসমূহে থাকতে হবে।

২২. পরিপূর্ণ ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার অভাব : ১৯৬৯ সালে OIC প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে তাদের স্বকীয় অর্থব্যবস্থার প্রচলন করা। OIC-ই প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং-এর সংগা প্রদান করেছে এবং সেখানে বলা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শরীয়াহ মেনে চলবে এবং এর সকল কার্যক্রম সুদমুক্ত থাকবে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৭ সালে ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB) প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯] বাংলাদেশ OIC এবং IDB-এর সদস্য পদ গ্রহণ করার পর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে ও সম্মেলনে ইসলামী আদর্শ, ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখে আসছে। ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে মক্কা ও তায়েফে OIC-এর তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে মুসলমানদের 'নিজস্ব ও স্বতন্ত্র' ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, 'The Islamic Countries should develop a seperate Banking system of their own in order to facilitate their trade and commerce.' অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের লক্ষে মুসলিম দেশসমূহের উচিত একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা।[২০] এর আগেই ১৯৮০ সালের ২৬ জুন The legal framework of Pakistan's finnancial and co-operative system পরিবর্তন করে মুদারাবা লেনদেন এবং Participation Term Certificate (PTC) ইস্যু করার অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৭৯ সালে ইরানের রাজতন্ত্র উৎখাত হওয়ার পর আয়াতুল্লাহ খোমেনি ১৯৮১ সালে সেদেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়া ও তুরস্কে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাশ করা হয়। ১৯৮৪ সাল থেকে ইরানের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থা শরীয়তের আলোকে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানে ৭টি ব্যাংকিং আইন সংশোধন করা হয়। আইনগুলো হলো, The Partnership Act, The Banking Companies Ordinence, The wealth Tax act and Capital Issues 1974. সুদানের ব্যাংক ব্যবস্থাও ইসলামী শরীয়তের আলোকে পুনর্গঠনের জন্য এ সময় উদ্যোগ নেয়া হয়।[২১]

বাংলাদেশ বিভিন্ন সম্মেলনে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে যেভাবে গুরুত্ব সহকারে বক্তব্য পেশ করে আসছে সেভাবে এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা

হয়নি। সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এদেশে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ঠিকই কিন্তু প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কার এখনও হয়নি।

সুপারিশমালা

১. বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে একটি সেন্ট্রাল শরীয়াহ কাউন্সিল থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব্যাংক নিজের দায়িত্বে এই শরীয়াহ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করলে এবং শরীয়াহ বোর্ডের সদস্যদের নিয়োগ ও বেতন-ভাতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হলে এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর সচ্ছতা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং সেন্ট্রাল শরীয়াহ কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে কেউ একটি ব্যাংক খুললেই একে ইসলামী নামকরণ করতে পারবে না এবং শরীয়াহ বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল শরীয়াহ কাউন্সিল আরো কার্যকর এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখতে সমর্থ হবে। ফলে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং এ সুদমুক্ত ও সুদযুক্ত বিষয়ে যে বিভ্রান্তি রয়েছে তা দূর করা সম্ভব হবে। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় নজরদারী প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে সেন্ট্রাল শরীয়াহ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে সচ্ছতা আসবে না। আর তা প্রতিষ্ঠিত হলে শরীয়াহ প্রতিপালনকারী ব্যাংকগুলোও তাদের কার্যক্রমে সচ্ছতা আনয়ন করতে পারবে। তাই বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরীয়াহ বিষয়ক নজরদারী অত্যন্ত জরুরী।

২. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য 'ব্যাংকিং কোম্পানীজ এ্যাক্ট, ১৯৯১' কে ইসলামী শরীয়াহর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আইনের একটি খসড়া বেশ কয়েক বছর আগে পার্লামেন্টে অনুমোদনের জন্য জমা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় ইসলামী আইনের সংস্কার এখনও আলোর মুখ দেখেনি। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যংক ব্যবস্থা যেভাবে সফলতার পরিচয় দিতে পেরেছে সেখানে প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কারের বিলম্ব ঘটানোর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তাই আইনগত জটিলতার কারণে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে না এটা এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের সাধারণ দাবি।

৩. যে কোন সৎ ব্যবসার সাধারণ বৈশিষ্ট হলো সেখানে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি থাকবে। তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহকে শুধু মার্ক-আপ ভিত্তিক বিনিয়োগের পরিবর্তে লাভ-লোকসানে অংশীদারীর ভিত্তিতে বিনিয়োগে অধিক অংশগ্রহণ করতে হবে।

৪. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে সার্থক করা দেশের মানুষকে সুদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য সৎ ও বিবেকবান লোকদের এগিয়ে আসতে হবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নিজেদের উত্তম রিযিক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হতে হবে। ব্যবসার মধ্যেই আল্লাহ পাক অধিক পরিমাণ রিযিকের ব্যবস্থা রেখেছেন।

৫. ইসলামী অর্থ বাজারকে সম্প্রসারণ ও লাভজনক করার জন্য অধিক পরিমাণে ইসলামী বন্ড, সিকিউরিটিস, ফাইনান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট বাজারে থাকা দরকার।

৬. বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক সহায়তা থাকলে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে।

৭. ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন বিনিয়োগ মুড যে বিষয়ে অনেক গ্রাহক এবং শিক্ষিত জনসাধারণেরও ধারণা কম এ সম্পর্কে গ্রাহকদের পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। এর জন্য অধিক সংখ্যক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও গ্রাহক সমাবেশের আয়োজন করতে হবে এবং ইসলামী ব্যাংক যে সুদকে পরিপূর্ণভাবে বর্জন করার দৃঢ় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলছে সে বিষয় নিজেদেরকে আরো শক্ত করতে হবে। কেউ কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামী ব্যাংক সুদ ঘুরিয়ে খায় মন্তব্য করে থাকেন, আবার কেউ কেউ না জেনে বুঝেই মন্তব্য করেন এ অজ্ঞতাকে দূর করার দায়িত্ব ইসলামী ব্যাংকসমূহের।

৮. ইসলামী ব্যাংকসমূহের উচিত তাদের মার্কেটিং বিভাগে সেলস্ উইং খোলা এবং সেলস অফিসার নিয়োগ দেয়া এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাজার তৈরির কাজে লাগানো। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রচারণার জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির ব্যাপারে চিন্তা করা যেতে পারে।

৯. ইসলামী ব্যাংকসমূহের ট্রেনিং একাডেমীগুলো ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো ও সমমনা অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র তৈরিসহ গবেষকদের পর্যাপ্ত সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। উচ্চমানের বৃত্তি দিয়ে এদিকে গবেষকদের আকৃষ্ট করতে হবে।

১০. বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রশিক্ষণ একাডেমীগুলোকে আরো আধুনিক এবং এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। দক্ষ ইসলামী ব্যাংকার তৈরির জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। ইসলামী ব্যাংকিং যেহেতু এখন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে সেহেতু এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সরকার কর্তৃক সকল পর্যায়ের সিলেবাসে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক জ্ঞান সংযুক্ত করতে হবে।

১১. ইসলামী ব্যাংকসমূহে কর্জে হাসানা ভিত্তিক অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ থাকতে হবে। প্রয়োজনে ব্যাংক প্রতি বছর তাদের লভ্যাংশ থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ কর্জে হাসাসার জন্য পৃথক করে রাখবে। মানুষের কল্যাণই যেহেতু ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য, সেহেতু মানুষের সকল ধরনের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা ইসলামী ব্যাংকসমূহে থাকতে হবে।

১২. ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম যেহেতু এদেশে সফলতার পরিচয় দিয়েছে এবং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সেহেতু দেশের গোটা অর্থব্যবস্থাকেই ইসলামীকরণের কোন বাধা বা সমস্যা থাকতে পারে না। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই

দেশের অর্থ ব্যবস্থা ইসলামীকরণে সরকারের উদ্যোগই মূখ্য। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইসলামী অর্থনীতির পক্ষে যেভাবে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখে তাতে সে বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার ব্যাপারেও আমরা আশাবাদী।

উপসংহার

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা বাংলাদেশী মুসলমানদের প্রাণের দাবি। গত দুই দশকে ইসলামী ব্যাংকিং সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। এখন প্রয়োজন এর সকল কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত করা। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর যেমন সঠিক কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তেমনি সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে সুদমুক্তভাবে পরিচালিত হতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা। বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে এর সমস্যাগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং এ বিষয়ে যথার্থ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এর সাথে সাথে ইসলামী শরীয়তের আলোকে কি কি সমস্যা রয়েছে এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে কোন কোন পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করার প্রয়োজন। সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা গেলে এবং লক্ষভেদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা দারিদ্র্যতা দূরীকরণ সম্ভব হবে এবং যে কল্যাণ সাধনের জন্য সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়েছিল তা সফল হবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২৭৯।

২. তাজুল ইসলাম ও আবু তাহের মোহাম্মদ সালেহ, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা, ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা, ১ম সং, ১৯৮৪, পৃ. ১৬।

৩. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, অধ্যাপক, ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা, ১ম সং, ১৯৯৬, পৃ. ২৬।

৪. বিস্তারিত দ্র. ইসলামী ব্যাংক অগ্রগতির ২১ বছর, ইসলামী ব্যাংক বংলাদেশ লিঃ-এর একুশ বছর পূর্তি সংখ্যা, দৈনিক সংগ্রাম, ২০০৪ ইং, পৃ. ১৫।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০২, দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ, পৃ. ১৫।

৮. Manual for General Banking Operations, Islami Bank Bangladesh Ltd, P.3.

৯. Ibid 4.

১০. Ibid 4.

১১. অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সাফল্য-অসাফল্য সমস্যাও দিক নির্দেশনা, ইসলামী ব্যাংক অগ্রগতির ২১ বছর, প্রাগুক্ত পৃ. ১১০।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

১৩. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, ইসলামী ব্যাংকিং-এর ইসলামী সমস্যা, ইসলামী ব্যাংক অগ্রগতির ২১ বছর, প্রাগুক্ত পৃ. ৬৩।

১৪. মোঃ আব্দুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃ. ৬৬-৬৮।

১৫. Annual Report 2004-2005, Bangladesh Bank, Chapter-6, (Finnancial Market).

১৬. 'দার আলমা'ল আল ইসলামী' একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৮০ সালে এটি বাহামা ও সুইজারল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৫।

১৮. M. Kabir Hassan, M. Muzahidul Islam, Islamic Banking movement in Bangladesh, ইসলামী ব্যাংক অগ্রগতির ২১ বছর, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৭।

১৯. ইসলামী ব্যাংক অগ্রগতির ২১ বছর, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫।

২০. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং, কুড়ি শতকের শ্রেষ্ঠ অর্জন ইসলামী ব্যাংক অগ্রগতির ২১ বছর, প্রাগুক্ত পৃ. ৩০৮।

২১. প্রাগুক্ত।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা : ৪৫-৫৮

ইসলামী শরীয়তের লক্ষ

শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় লাভের উপায়

ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম

॥ দুই ॥

আহকামের কার্যকারণ

তা'লীল শব্দটি ইল্লাত ধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। শব্দটির বিভিন্ন রূপ আছে। বলা হয়ে থাকে- এটা এটার কারণ।

যুক্তিবিদ্যা বিশারদদের পরিভাষায় 'তা'লীল' হলো কোনো কিছুর কারণ বর্ণনা করা। যে জিনিসের ওপর কারণ প্রযোজ্য সেটিকেও তালীল অর্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তখন তালীলকে যুক্তিগ্রাহ্য দলীল রূপে আখ্যায়িত করা হয়।[২]

উসূলবিদগণ কখনো একে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণার্থে রচিত আল্লাহর আইন কানুন অর্থাৎ কল্যাণ অনুযায়ী কার্যকারণ নির্ণয় করা মনে করেছেন। আবার কখনো তারা এর সাহায্যে শরয়ী আহকামের এবং তার উদ্ভাবনের অবস্থা মনে করেছেন।

মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহর আহকাম সৃষ্ট হয়ে থাকলে তর্কশাস্ত্র মতে এ ব্যাপারে বিতর্ক দেখা দেয়। কারণ আল্লাহর কাজের মধ্যে কার্যকারণের উপস্থিতি বাস্তব বিরোধী। বিষয়টিকে উসূলে ফিকহের[৩] আওতায় এনে কেউ কেউ বলেছেন : আল্লাহর কাজগুলো কার্যকারণ ভিত্তিক নয়। কাজেই তাঁর আহকামও কার্যকারণ ভিত্তিক হবে না। এ অভিমত ইমাম ফখরুদ্দিন রাযীর। এ কারণে শরয়ী আহকামের কারণ সমূহের অর্থ হবে, বিশেষ আহকামের আলামতের পরিচয় পাওয়া।

ইমাম শাতবী বলেন : এটিই যথেষ্ট যে, মানব কল্যাণের জন্য সৃষ্ট শরীয়ত জানার জন্য আমরা কারণ অনুসন্ধান করি। জানার জন্য অনুসন্ধান কাজে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম রাযী বা অন্য কারোর দ্বিমত নেই।[৪]

এক্ষেত্রে 'তালীল'-এর দ্বিতীয় অর্থ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর আহকাম মানব কল্যাণের জন্য নিশ্চিত করা। ইতোপূর্বে 'উদ্দেশ্যসমূহ' অনুচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে তালীল বিভিন্ন হয়ে থাকে।

যে নির্দেশের স্পষ্ট দলিল নেই তার ঘটনা সম্পর্কে কিয়াসের মাধ্যমে জানতে হবে। কিয়াস হলো, নির্দেশের কার্যকারণে মূল ও শাখার শরীক হওয়ার ভিত্তিতে মূলের জন্য যে নির্দেশ শাখার জন্যও সেই নির্দেশ সাব্যস্ত করা।[৫]

নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হওয়ার অর্থ কখনো এটা হয় যে, মুজতাহিদ শরয়ী নির্দেশটি এক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীল হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্ট ঘটনা সম্পর্কে গবেষণা করবেন। এ ধরনের গবেষণা কাজ ঐশী কল্যাণ নামে অভিহিত। ঐশী কল্যাণ হলো, গ্রহণ বা বর্জনের সাক্ষ্য ছাড়া প্রতিটি কল্যাণের কাজই শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যে হওয়া।[৬]

আবার কখনো কার্যকারণ বর্ণনা করার অর্থ হয়, ফায়দার জন্য দলিলভিত্তিক আহকামের কার্যকারণ নিয়ে আলোচনা করা। হুকুমটি নিশর্ত আনুগত্যমূলক, যা অপূর্ণাংগ কারণ সম্পন্ন। তালীল নামে অভিহিত হোক, কিংবা তালীল জায়েয হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে উসূলবিদদের মধ্যে যে মতভেদ আছে তার হিকমত বর্ণনা করা হোক।[৭]

কুরআনের অনেক আয়াত ও সুন্নত ভিত্তিক দলিল কার্যকারণ সম্বলিত। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তাবা তাবেঈদের অনুসৃত নীতিগুলোও আল্লাহর আহকাম মানব কল্যাণের নিমিত্তে হওয়ার ব্যাপারে আকাট্য দলিল রূপে গণ্য। যেসব ঘটনা প্রবাহ দলিল ভিত্তিক নয় সেগুলো দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যশীল প্রক্রিয়ায় দলিল ভিত্তিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং আহকামের তালীলের ব্যাপারে অবশেষে কোনো বিরোধিতার অবকাশ থাকবে না।

ইমামুল হারামাইন তাঁর বুরহান নামক গ্রন্থে লিখেছেন : আমি বিশ্ব নন্দিত সাহাবীদের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। তাঁদের আদর্শ ও চরিত্র অপূর্ব-অনন্য। তাঁদের মধ্যে কাউকে এরূপ দেখা যায়নি যে, পরামর্শ সভায় বসে ভূমিকা স্বরূপ কিছু আলোচনা করে তার ওপর ভিত্তি করে একটি ঘটনা রচনা করেছেন। বরং তাঁরা রায় ও মতামতের কারণ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছেন। মতামতের কারণসমূহের ভিত্তি আছে কি নেই সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল না।[৮]

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা'য় বলা হয়েছে : দলিল অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে শুধুমাত্র মনের প্রশান্তি লাভই সাহাবাগণের মতে প্রকৃষ্ট উপায়। যেমন দেখা যায়, আরবরা ব্যাখ্যা অথবা ইশারা-ইংগিতের মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক কথাবার্তা ও আচার-আচরণের উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হতো।

পরবর্তীতে নবী আলাইহিস সালামের ইন্তিকালের পর সাহাবাগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং ইসলামী দেশসমূহে তাদের প্রত্যেকেই অনুসরণীয় হয়ে ওঠেন। ইসলামের প্রসার ও প্রচারের সাথে সাথে সমস্যা ও ঘটনা প্রবাহ বাড়তে থাকে। রসূলের বাণী তাঁরা যেভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন সেই অনুযায়ী অথবা নিজেদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁরা সেসব সৃষ্ট সমস্যার সমাধান বা ফতওয়া দিতে থাকেন। যেসব ব্যাপারে সংরক্ষণ বা অনুসৃত নীতি সমাধানের জন্য যথোপযোগী নয় সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের রায়ের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো হুকুমের সাথে যে কার্যকারণ সম্পৃক্ত

করেছেন সে ধরনের কারণ সম্পৃক্ত সমস্যার সমাধান তাঁরা নবীর উদ্দেশ্যের সাথে সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রদান করেছেন। অন্যথায় সে ধরনের হুকুম বর্জন করেছেন।[৯]

এটাই ছিল সাহাবাগণের বৈশিষ্ট। পরবর্তী প্রজন্ম অর্থ অনুধাবন, উদ্ভাবন ও শরয়ী দলিলের তালীলের ব্যাপারে তাদের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে থাকেন। হিজরীর প্রথম ও দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত তাদের নীতিমালা অব্যাহত থাকে। তখনো পর্যন্ত তাদের মত ও নীতিমালা বিরোধী কোনো কার্যকলাপ দেখা যায়নি। কেননা এ দুই যুগের আলেমগণ বিশ্বাস করতেন যে, ইসলামের বিধিবদ্ধ, বিধান মানব কল্যাণ বাস্তবায়ন ও অকল্যাণ দূরীকরণার্থে রচিত হয়েছে এবং তা বান্দার জন্য আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত স্বরূপ।

শরয়ী হুকুম কেবলমাত্র কল্যাণ কার্যকর করার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। এর মূল লক্ষ হলো মানবসত্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, দীন, বংশ ও সম্পদ রক্ষা করা। সমস্ত উদ্দেশ্যের মধ্যে শরীয়তের বহিপ্রকাশ ঘটবে। শরীয়তের বিধান এ দৃষ্টিকোণ বহির্ভূত হওয়া অসম্ভব।[১০] নসের তালীলের মূল উদ্দেশ্যে যখন শরয়ী আহকামকে দলিলবিহীন অনুরূপ ঘটনা প্রবাহের দিকে ধাবিত করা হয় তখন এরূপ শরীয়তের অন্য প্রয়োজন হয় নসের তালীল এমনভাবে সমুজ্জ্বল করা যাতে নবসৃষ্ট সমগ্র ঘটনাপ্রবাহ এর আওতায় এসে যায়। শরয়ী বিধান চিরন্তন হবার মধ্যে এ রহস্যই নিহিত রয়েছে।

স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে নসের তালীল করার উপর তৃতীয় হিজরী শতকের আগে কোনো ধরনের বিরোধিতা দেখা দেয়নি। হিজরী তৃতীয় শতকে শরীয়তের নসসমূহ তালীল করার উপর নিষেধাজ্ঞার আওয়াজ ওঠে। নির্দেশের কারণ অনুসন্ধান ছাড়া এবং নস না থাকার ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত না করে শুধুমাত্র শরয়ী দলিলের উপর ভিত্তি করে কাজ করার আহ্বান আসে।

দাউদ ইবনে আলী ইস্পাহানী র. এ আওয়াজ তোলেন। যাহেরী মতাবলম্বীদের তিনি ছিলেন ইমাম। তাঁর মৃত্যু হয় ২৭০ হিজরীতে। তিনি কিয়াস উপেক্ষা করে সর্বপ্রথম সরাসরি কুরআন ও হাদীসভিত্তিক কাজ শুরু করেন।[১১]

'জামউল জাওয়ামে' গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন দাউদ যাহেরী প্রকাশ্য ও স্পষ্ট কিয়াস সমর্থন করেছেন কিন্তু ইবনে হাযম সব ধরনের কিয়াস অস্বীকার করেছেন।[১২]

এ মতের প্রতিষ্ঠার ওপর আপতিত কঠোরতা ও অক্লান্ত শ্রমের কারণে মতটির প্রচার ও প্রসারে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ফলে সমকালীন লোকদের অনেকেই মতটি অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে।[১৩]

তাঁর মতে বিশ্বাসী লোকদের উপর এসব আপতিত কঠোরতা ও ঘটনা প্রবাহের প্রভাব সৃষ্টি হয়। তারা তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে এবং সাহায্য-সহায়তা দেয়।

ফলে এ মতটি সেসময় রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতবাদের কাছাকাছি গিয়ে পৌছে এবং অতি সন্তর্পণে ফিকহী মতবাদের দোরগোড়ায় উপনীত হয়।

যাহেরী মতবাদের ব্যাপারে বলা যায় রায়, কিয়াস ও শরয়ী আহকামের তালীলের উপর যখন শরয়ী আহকাম গ্রহণ ও বাতিল নির্ভরশীল ছিল তখন ইবনে হাযমের (র) আবির্ভাব ঘটে। ৪৫৬ হিরজীতে

তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি শক্তিপ্রয়োগ করে শিক্ষানীতির আওতাভুক্ত করে তার মতটি শক্তিশালী করেন। এ বিষয়ে 'আল মুহাল্লা' ও 'আল আহকাম' নামে দুটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ দুটিই যাহেরী মতাবলম্বীদের সমস্ত মূল ও খুঁটিনাটি বিষয়ের উৎস।[১৪]

কিয়াস অস্বীকারকারী প্রসিদ্ধ লোকদের মধ্যে নিযাম অন্যতম। তবে তাঁর অস্বীকৃতি বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক গৃহীত হয়নি। মুতাযিলা সম্প্রদায়ের সকল ইমাম এটা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। বস্তুত তিনি ছিলেন প্রথম দিকের কিয়াস অস্বীকারকারীদের একজন।[১৫]

কিয়াসের ব্যাপারে ইমামীয়া শিয়াগণ দুদলে বিভক্ত। একদল উদ্ভাবিত কার্যকারণ এবং দলিল দ্বারা প্রমাণিত কার্যকারণ সম্বলিত কিয়াসের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা উদ্ভাবিত কার্যকারণ সম্বলিত কিয়াস অস্বীকার করে কুরআন, হাদীস ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। দ্বিতীয় ধরনের কিয়াস সম্পর্কে তাদের ভাষ্য হলো, এটা নিছক কিয়াস নয় বরং নস বা দলিলকে প্রচলিত অর্থের প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক করা।[১৬]

অপর দলটি নস ভিত্তিক কিয়াস এবং উদ্ভাবিত কিয়াসের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। তাদের মধ্যে উভয় ধরনের কিয়াসই পরিত্যাজ্য। এগুলো গ্রহণ বা এগুলোর ওপর নির্ভর করা যায় না।[১৭]

কিয়াস নিয়ে কথার সূত্রপাত হয় এ কারণে যে, শরীয়তের নস প্রান্তিক কিন্তু ঘটনা প্রবাহের কোনো প্রান্তিক সীমারেখা নেই। চলমান ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশের বর্ণনা মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

শিয়া ইমামীয়াগণ নসের প্রান্তিকতা স্বীকার করেন না। বরং তারা মনে করেন, একজন ইমাম বা নেতৃত্ব দেবার মত লোকের আবির্ভাব মূলতই আল্লাহর বিরাট মেহেরবাণী। তাদের ধারণা, আবির্ভূত ইমাম জন্মগতভাবে মাসূম। নবীগণ যে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ জীবন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, ইমামগণ তা মীরাসী সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। প্রত্যেক ইমামই পরবর্তী সময়ের জন্য একজনের থেকে ইমামতির শপথ নেন। তিনি কৌশলের সাথে পরবর্তী সময় তার মিশন চালিয়ে যান।[১৮]

এরূপ চিন্তাধারাই কিয়াস ও তালীল অস্বীকার করার যুক্তি। তারা মনে করেন, তালীল ও কিয়াসের মাধ্যমে প্রমাণিত বস্তুর অনুসরণের চেয়ে একজন নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ লোকের অনুসরণ করা অধিকতর শ্রেয়। তবে তাদের মতে এই নিষ্কলুষতা ও নেতৃত্ব ইমাম মাহদীর জন্য নির্ধারিত। তাদের ধারণা অনুযায়ী এই ইমাম মাহদী ২৬৫ হিজরীতে সারাদীপে অদৃশ্য হয়ে যান।[১৯]

ইমামের অদৃশ্য হওয়ার ফলে তাদের অনুসরণযোগ্য বিশেষ নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। কাজেই তাদের মতে প্রতি যুগেই ইজতিহাদ করা জরুরী।[২০]

এ কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের কিয়াস সম্বলিত কথা এবং মুজতাহিদদের গৃহীত মৌল উৎস সম্পর্কে নীরবতার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মৌল উৎসগুলো হলো : কুরআন, হাদীস, ইজমা ও বুদ্ধি।[২১]

ইমামীয় শিয়াগণ মনে করেন, কোনো কাজ বা ঘটনার ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণ হওয়া না হওয়ার প্রসংগটি নির্ণয় করতে পারে মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। কাজেই যেসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট নস

নেই সেসব ব্যাপারের আদেশ নিষেধ প্রসংগটি কেবলমাত্র জ্ঞানই নির্ণয় করতে সক্ষম। বস্তুত মুতাযিলাগণও এমত পোষণ করে থাকেন।[২২]

তবে শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণের অধিকাংশই শরীয়তের আহকামের নসের তালীল করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মৌলিক তালীল করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। তবে হুকুম স্থানান্তরিত করা (তা'দিয়া) জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আরোপিত শর্তাবলী সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের চার ধরনের বক্তব্য আছে :

এক. তালীল করার দলিল দাঁড় করানোর পূর্ব পর্যন্ত নস তালীল বিহীন হওয়াই মূল কথা।

দুই. অন্য কোনো বৈশিষ্টের কারণে তালীল করা নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত নসের হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক কল্যাণমূলক বৈশিষ্টময় তালীল যুক্ত হওয়াই মূল কথা।

তিন. নস্ বৈশিষ্টমণ্ডিত তালীল যুক্ত হওয়াই মৌল কথা। তবে বৈশিষ্টের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী দলিল থাকা বাঞ্ছনীয়।

চার. নস্ তালীল যুক্ত হওয়াই মৌলিক কথা। তবে বৈশিষ্ট যা কারণ রূপে গণ্য তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী দলিল থাকা বাঞ্ছনীয়। এর সাথে আরো কথা হলো, তালীল ও পার্থক্য করার আগে যে দলিলের কারণ নির্ণয় করার ইচ্ছা সে দলিলটি কার্যকারণ সম্বলিত হওয়ার দলিল থাকা জরুরী।

উপরের চার ধরনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা :

প্রথম ধরনের বক্তব্যের কারণ : নস্ বা দলিল তার কারণসহ নয়, বৈশিষ্টসহ হুকুমকে ওয়াজিব করে থাকে। কেননা শরয়ী কারণসমূহ নস বা দলিল হওয়ার নিদর্শন নয়। হুকুম কখনো তালীলের ছত্রছায়ায় কাঠামো থেকে কারণের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে, যাকে আসল থেকে রূপক অর্থে গণ্য করা যায়। দলিল ছাড়া এ ধরনের স্থানান্তর ঠিক নয়। কারণ দলিলের অবকাঠামোর পরিচয় শ্রবণ এবং অর প্রকৃত তাৎপর্য জানার উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে দলিলের শরীয়তসম্মত অর্থের পরিচয় লাভ করা তার প্রকৃত তাৎপর্য জানার ওপর নির্ভরশীল নয়। যেমন পরোক্ষ অর্থ জানা। বরং এর থেকেও অনেক দূরে। কেননা কোনো জিনিসের পরোক্ষ অর্থ এক ধরনের দর্শন বৈ কি! অবস্থার বাস্তবতার আলোকে মূল কথা হলো : দলিলের কাঠামোগত দৃষ্টিতে কাজ করতে হবে, অর্থগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। কাজেই এরূপ মৌলিকতা পরিহার করা এবং দলিল ছাড়া এর অর্থ পরিবর্তন করা বৈধ নয়। যেমন হাকীকাত পরিত্যাগ করা এবং হাকীকাতের অর্থ দলিল ছাড়া পরিবর্তন করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয় ধরনের বক্তব্যের কারণ : নস ও নসের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য নির্ণয় করা ছাড়া কিয়াসের যুক্তির উপর দলিলসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা। ফলে তালীলটি মৌলিক বা আসল হওয়ার সক্ষমতা লাভ করে। সমস্ত বৈশিষ্টসহ তালীল করা সম্ভব নয়। আবার কিছু বাদ দিয়ে এবং কিছু গ্রহণ করেও তালীল করা সম্ভব নয়, যাতে যাবতীয় বৈশিষ্টসহ তালীল নির্দিষ্ট হতে পারে। তবে নস কিংবা ইজমা বিরোধী কিংবা বৈশিষ্টসমূহের প্রতিকূলে কোনো বাধা থাকলে সেটা হবে স্বতন্ত্র ব্যাপার।

যেমন হাদীস বর্ণনা করার বাপারে নিয়ম আছে, হাদীস হুজ্জত বা দলিল রূপে প্রমাণিত হলে তদনুযায়ী কাজ করা ওয়াজিব। রাবীগণের বিবরণ ছাড়া হাদীস প্রমাণিত হয় না। রাবীগণ এ কথায় একমত যে, রাবী কর্তৃক বর্ণিত প্রতিটি হাদীস অভিযোগ মুক্ত হওয়ায় প্রতিটি বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত দলিল রূপে গণ্য, যা কোনো প্রতিবন্ধক ছাড়া পরিত্যাগ করা যাবে না। অকাট্য দলিল রূপে গণ্য হাদীস নস বা ইজমার বিরোধিতা অথবা রাবীর পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কথা প্রকাশ পাওয়া ইত্যাকার কাজগুলো হলো প্রতিবন্ধক। এমনিভাবে নসের তালীল যখন তার সবকিছুসহ অভিযোগ মুক্ত হবে তখন সমস্ত গুণ বা বৈশিষ্ট কার্যকারণ রূপে পরিগণিত হবে, যদি কোনো বাধা না থাকে।[২৪]

তৃতীয় ধরনের বক্তব্যের কারণ : সেটা হলো, সমস্ত গুণাবলীসহ তালীল করা এবং প্রত্যেকটি বৈশিষ্টসহ তালীল করা অসম্ভব হওয়া। কেননা এগুলোর মধ্যে যা অসম্পূর্ণতার হুকুম আসল থেকে স্থানান্তর করা অবশ্যই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যা স্থানান্তরযোগ্য তা শাখা-প্রশাখায় স্থানান্তর করা ওয়াজিব। এটা হচ্ছে পারস্পরিক প্রতিকূলতা। কাজেই কিছুকে নির্ধারণ করতে হবে। তালীল কখনো কিয়াসের জন্য আবার কখনো নসের জায়গায় হুকুম অসম্পূর্ণ থাকার কারণে প্রযোজ্য হয়। সবকিছু তালীল করা যখন অসম্ভব তখন সমুদয় থেকে একটিসহ তালীল করা কর্তব্য। আর এরূপ করা অজ্ঞাত। অজ্ঞতাসহ তালীল করা বাতিল। কাজেই তালীলের জন্য সমগ্র গুণাবলীর মধ্যে কোনো একটি গুণ নির্ধারক দলিল হওয়া বাঞ্ছনীয়।[২৫]

চতুর্থ ধরনের বক্তব্যের কারণ : একথা স্পষ্ট যে, নসসমূহের মূল হচ্ছে তালীল। তালীল হচ্ছে, দোষারোপ ও ভুল-ত্রুটির সংশোধনী। এ কারণে তালীল শুরু করার আগে মূল দলিল প্রতিষ্ঠা করা দরকার। অর্থাৎ এমন নস যার তালীল দ্বারা দলিলটি বর্তমানে কারণ সম্বলিত হওয়াই হচ্ছে উদ্দেশ্য। দলিলটি তা উৎস দ্বারা সংকুচিত নয় এবং তার হুকুম অন্যদিকেও সম্প্রসারিত হবে। এগুলো 'ইস্তিহসাবে হাল'-এর উদাহরণ। যখন প্রকাশ্য প্রক্রিয়ায় এটা প্রমাণিত হলো তখন যুক্তি প্রতিষেধক হওয়া দোষারোপ সূচক না হওয়া সঠিক হয়ে গেলো। এমনকি নিখোঁজ ব্যক্তির বেঁচে থাকা এই প্রক্রিয়ায় যখন প্রমাণিত তখন তার অধিকার চাওয়ার দাবি নাকচ করার এটা একটা যুক্তি বা দলিল। এ অবস্থায় নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পদের কোনো ওয়ারিস দাবি করা যাবে না এবং দাবি করার কারণও সংগত হবে না। এমন কি যদি তার কোনো নিকটাত্মীয় মারা যায় তাহলে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়া সংশয়পূর্ণ হওয়ায় সে তার ওয়ারিস হতে পারবে না। অনুরূপভাবে অজ্ঞাত অবস্থার (মাজহুলুল হাল) হুকুমও একই রূপ। কোনো ক্রীতদাসের সাক্ষ্য তার ক্রীতদাস হওয়ার কারণে সংশয়পূর্ণ হওয়ায় তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। কেননা মানুষ মূলত স্বাধীন। যদি কোনো শত্রু তার স্বাধীনতায় অপবাদ দেয় তাহলে মৌলিকভাবে তা নিরসনের সম্ভবনায় অপবাদের যুক্তি ধোপে টিকবে না। এভাবে যখন মৌলিক বিষয় কারণ সম্বলিত হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায় তখন আর সন্দেহ বাকি থাকে না। ফলে বিষয়টি একটি যুক্তি বা দলিলের রূপ পরিগ্রহ করে।[২৬]

এ কথা স্মর্তব্য যে, তালীলের অর্থ হচ্ছে নস-এর কারণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। কারণের মাধ্যমে হুকুম নসের স্থান ছাড়া অন্যত্র সংক্রমিত করার প্রসংগটি এ থেকে এড়িয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে কারো এমনকি যাহেরীয়াদেরও কোনো দ্বিমত নেই। কেননা এ ধারাটি কুরআন ও হাদীস সমর্থিত।[২৭]

তালীল সম্বলিত বক্তব্য যে কিয়াস সম্বলিত বক্তব্য হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে কিয়াস সম্বলিত বক্তব্য তালীল সম্বলিত বক্তব্য হতে বাধ্য করে। কেননা সকল তর্কশাস্ত্রবিদগণের মতে ইল্লাত বা কারণ কিয়াসের একটি স্তম্ভ। এটা ছাড়া হুকুমের জন্য তা সম্প্রাসারিত হতে পারে না।

আমরা জানতে পারলাম উপরোক্ত চারটি অভিমত কিয়াস কিংবা তালীলের দিক থেকে মূলত পারস্পরিক সাংঘর্ষিক নয়। তবে দলিলের মধ্যে প্রকৃতিগত মতপার্থক্য আছে। দলিলটি তালীলের ওপর নির্ভরশীল দলিল ছাড়া মূলত তালীলবিহীন নাকি তালীলের প্রতিবন্ধকতার কারণ ছাড়া দলিলটি মূলত তালীল সম্বলিত। এ স্বাভাবিকতায় কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। বিতর্কের এ বিন্দুর একদিকে অবস্থান করছেন প্রথম ধরনের প্রবক্তাগণ এবং অন্যদিকে অপর তিনটি মতের সমর্থকগণ। এ বিতর্ক সাধারণভাবে তালীল কিংবা কিয়াসের অন্তরায় নয়। বরং প্রথম ধরনের প্রবক্তাদের মতানুযায়ী কিয়াসের সীমানা চিহ্নিত করা কিংবা দ্বিতীয় ধরনের মতানুযায়ী সম্ভবনাকে বিস্তীর্ণ করা হয় মাত্র।

তৃতীয় ও চতুর্থ মতাবলম্বীগণ দ্বিতীয় মতের সাথে একাত্ম হয়ে তালীলকে নসের মূল বলেছেন। তবে তারা কারণরূপে গণ্য এমন গুণাবলীকে সম্পৃক্ত হওয়ার অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেছেন। তৃতীয় মতাবলম্বীগণ অন্যের সাথে পার্থক্য নির্ণয়কারী বৈশিষ্টকে দলিল হিসেবে শর্ত গণ্য করেছেন। চতুর্থ মতাবলম্বীগণ অতিরিক্ত একটি শর্ত আরোপ করেছেন। শর্তটি হলো, যে নস দ্বারা তালীল করা উদ্দেশ্য তার কারণ সম্বলিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বর্তমান ঘটনাকে পূর্ববর্তী অনুরূপ প্রমাণিত ঘটনার ওপর কিয়াসের প্রক্রিয়ায় এবং অবতীর্ণ সংশোধনী প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করেছেন। তাঁরা সাধারণ সঠিক নিয়মাবলীর প্রক্রিয়ায় 'ইসতিহসান'-এর নীতি অবলম্বন করেছেন।

তাদের মতে যেসব ক্ষেত্রে কোনো নস নেই সেসব ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করাই হচ্ছে প্রথম প্রক্রিয়া। কেননা আংশিক অর্থের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা সঠিক অর্থের অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়ার সম্পৃক্ত করার চাইতে অধিকতর শক্তিশালী। যেমন শ্রেণীর অংশীদারিত্ব জাতির অংশীদারিত্বের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।

নবসৃষ্ট ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে কিয়াস ও তালীলের ভূমিকা যার কাছে অজ্ঞাত তিনি এটাকে বাধার প্রাচীর মনে করে পরিত্যাগ করবেন না। বরং হুকুম ও নির্দেশ হিসাবে একে স্থানান্তরিত করবেন। তবে প্রশ্ন হলো, এ কাজটি তিনি করবেন কেমন করে?

বিশেষজ্ঞগণ বলেন, নস কিয়াস বা ইসতিমবাতের মুখাপেক্ষী না হয়ে শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থের স্বাভাবিকতায় পূর্ববর্তী পরবর্তী সব ধরনের ঘটনাপ্রবাহকে শামিল করে থাকে।[২৮]

ঘটনাপ্রবাহের দোষত্রুটি অনুসন্ধানের ব্যাপারে যাহেরীয়াদের নীতির চেয়ে জমহুরের নীতি অধিকতর স্বীকৃত ও যুক্তিসংগত। কারণ শরয়ী বা আইনগত অর্থ কখনো আভিধানিক অর্থ পরিবর্তন করে দেয়। এজন্য অবস্থার ইংগিত, আচার-অনুষ্ঠান, অভ্যাস ছাড়া এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। সাহাবীদের নীতি জমহুরের প্রক্রিয়ার সমর্থক। এ মতের অনুসারীদের মতে কিয়াস প্রয়োগ করার ক্ষেত্র সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বীগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে।[২৯] কিয়াস সংক্রান্ত ইতিপূর্বেকার আলোচনায় একথা বলা হয়েছে।

ইল্লাত

পরিভাষাবিদদের মতে শব্দটি তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে :

এক. যে কাজ ভালো কিংবা মন্দকে বিন্যস্ত করে। যেমন ব্যভিচার কর্ম বংশে সংমিশ্রণ করে এবং হত্যাকর্ম হানাহানি ও মারামারির কাজ করতে উৎসাহিত করে। মালের বিনিময়ে মালের পরিবর্তন ধরনের বেচাকেনার দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের উপকার সাধন করে এবং উভয়ের মধ্যকার ক্ষতি ও অসুবিধা দূর করে যদিও বিনিময় না হয়ে থাকে।

দুই. যে আইনানুগ হুকুম কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ প্রতিরোধ করে। যেমন পূর্ববর্তী কল্যাণ সাধনে বেচাকেনা অনুমোদন করা, ব্যভিচার ও হত্যাকে হারাম সাব্যস্ত করা এবং কিসাস ও দণ্ডবিধি প্রবর্তনের মাধ্যমে বংশ ও মানবসত্তা রক্ষা করা।

তিন. বাহ্যিক নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট, যা আইনানুগ হুকুমের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য কল্যাণকর। যেমন কতল ও যিনা শব্দদ্বয় এবং ইজাব-কবুলের শাব্দিক প্রতিক্রিয়া (যেমন আমি বিক্রির প্রস্তাব করলাম বা আমি ক্রয় করলাম)।

উপরোক্ত তিনটি কাজকেই ইল্লাত বা কার্যকারণ নামে সঠিকভাবে আখ্যায়িত করা যায়। কাজেই বলা যায়, মালিকানা স্বত্ব স্থানান্তরিত করা এবং বেচাকেনার কল্যাণ অনুমোদন করার কারণ হলো ইজাব-কবুল অথবা এ কার্যক্রমের মধ্যস্থ কল্যাণসাধন কিংবা অকল্যাণ, অনিষ্টকারিতা ও অসুবিধা দূরীকরণ। এমনিভাবে কিয়াস ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো হত্যাকর্ম অথবা হত্যাকর্মের অকল্যাণ অর্থাৎ হানাহানি বন্ধ করা, শত্রুতা দমন করা এবং জীবন রক্ষা করা।[৩০]

কিন্তু পরবর্তী উসূলবিদগণ গুণাবলীকে 'ইল্লাত' নামের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন, যদিও তারা এটাকে 'মাজাযী' বা পরোক্ষ ইল্লাত বলেছেন। কেননা এগুলো প্রকৃত কারণের বিধিবিধান। যে কাজ ভালো কিংবা মন্দের প্রতি আকৃষ্ট করে সে কাজটিকেই তারা মূল কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর যে আইনানুগ হুকুম কল্যাণকর অথবা অকল্যাণকারিতা দমনকারী কিংবা আইনদাতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল সে হুকুমকে কেউ 'হিকমত' বা কৌশল নামে অভিহিত করে তাকে 'গায়াত ইল্লাত' বা চূড়ান্ত কারণ বলেছেন। হিকমত তথা কৌশল ও কল্যাণের সাথে তালীল করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে।[৩১]

জমহুরের মতে ইল্লাত হলো হুকুমের জন্য চিহ্নিত বৈশিষ্ট।[৩২] যেমন মাদকদ্রব্য। অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে মাদকতা বিদ্যমান থাকা ইল্লাত বা আলামত যা দ্রব্যকে হারাম করে দেয়। যেমন মদ ও নেশা সৃষ্টিকারী পানীয়। যখন শরীয়ত প্রণেতা বলেন, নেশার কারণে মদ হারাম করা হয়েছে তখন কার্যকারণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে এ কথা কেবলমাত্র নসের সাহায্যেই স্পষ্টত মনে করা যায়। মাদকতার কারণে মদ হারাম করা হয়েছে এ কথাটি তালীলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে বলতে হয়, দ্রব্যের মধ্যে মাদকতা থাকা হুকুম প্রযোজ্য হওয়ার প্রমাণ। এক্ষেত্রে বস্তুর হারাম হওয়ার ইল্লাত হলো মাদকতা। মদের বৈশিষ্ট হলো আসক্তি। এই আসক্তি বা মাদকতা মদের হুকুমের ব্যাপারে চিহ্নিত বৈশিষ্টরূপে সম্পৃক্ত হয়েছে।

হানাফী মতাবলম্বী আল্লামা বাযদবী ইল্লাত বা কার্যকারণের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে : নস বা দলিলের নির্দেশ যেসব বিষয় শামিল করে সেগুলো সম্পর্কে যার সাহায্যে জ্ঞাত হওয়া যায় তাই ইল্লাত। এক্ষেত্রে শাখা প্রশাখাগুলো হুকুমের জন্য উদাহরণ রূপে গণ্য হবে। তিনি আরো বলেছেন : ইল্লাত প্রথম থেকেই হুকুমের ওয়াজিবের সাথে সংযোজিত। যেমন বেচাকেনা করা মালিকানার ভিত্তিতে বিবাহ করা হালাল হওয়ার ভিত্তিতে এবং হত্যা করা কিসাসের ভিত্তিতে। তবে শরীয়ত সম্মত ইল্লাত স্বতই কোনো জিনিসকে ওয়াজিব করে না। কোনো হুকুম ওয়াজিব করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ।[৩৩]

কাজেই ইল্লাত-এর পরিচয়ের ধারার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তার সকল সংগার অর্থ এক ও অভিন্ন।

প্রথম পর্ব : শরয়ী কল্যাণের বৈশিষ্টসমূহের বর্ণনা ও কল্যাণের পরিচয়

কল্যাণের আভিধানিক অর্থ

বহুল প্রচলিত অভিধানগুলো অনুসন্ধান করে আমরা দেখতে পাই 'মাসলিহাত' বা কল্যাণ শব্দটি দুদিক থেকে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এক. যে কাজে 'সালাহ' তথা কল্যাণ নিহিত সে কাজটি উদ্দেশ্য হওয়া। এটা হলো শব্দটির পরোক্ষ প্রয়োগ। অর্থাৎ কারণকে আদি কারণের ওপর প্রয়োগ করা। যেমন কার্যসমূহ প্রয়োগ করা হয় কল্যাণকারিতার ওপর। যেমন জ্ঞান অন্বেষণ করা কল্যাণকর। কেননা জ্ঞান মৌলিক কল্যাণের উৎস বা কারণ। এমনিভাবে বলা যায়, কৃষি ও ব্যবসা কল্যাণকর কাজ। কারণ এ দুটি কাজ মানবিক কল্যাণের উৎস বিশেষ।

উপরোক্ত অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে 'মাসলিহাত' শব্দের অর্থ অকল্যাণের বিপরীতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ কল্যাণ ও অকল্যাণ শব্দ দুটি বিপরীত মুখী। একই সাথে দুটি বিপরীতমুখী শব্দের প্রয়োগ অসম্ভব। যেমন 'কামূসুল মুহীত' নামক অভিধানে বলা হয়েছে : ---- অর্থাৎ কল্যাণ অকল্যাণের বিপরীত। মাসলিহাত অনেক কল্যাণের একটি এবং কল্যাণ কামনা অকল্যাণ কামনার বিপরীত।'মুখতারুস সিহাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'কল্যাণ ফাসাদের বিপরীত। মাসলিহাত

কল্যাণসমূহের একটি এবং কল্যাণ কামনা অনিষ্ট কামনার বিপরীত। 'মিসবাহুল মুনীর' অভিধানে বলা হয়েছে : কোনো জিনিসকে যথার্থভাবে সংশোধন করার নাম মাসলিহাত। শব্দটি ফাসাদের বিপরীত। আসলে মাসলিহাত হলো মংগল ও কল্যাণের সমষ্টি।

দুই. মাসলিহাত হচ্ছে শাব্দিক ও অর্থের দিক থেকে উপকার সাধন করা। এটা হচ্ছে শব্দটির প্রকৃত অর্থ। একক অর্থে অনেক উপকারের একটি উপকার উদ্দেশ্য হতে পারে। কিংবা ধাতুগত দিক থেকে উপকার সাধন তথা উপকার করা উদ্দেশ্য হতে পারে। কোনো কোনো সময় উপকারিতার উপকরণ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ হয়। যেমন, লেখার উপকরণ কলম। কলমটি মাসলিহাত অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। মোটকথা মাসলিহাত শব্দটি মানব কল্যাণ সাধনের যাবতীয় উপায় উপকরণ অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কৃষিকাজ খাদ্য যোগানোর জন্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের জন্য মাসিলহাত-এর অন্তরভুক্ত।

শরীয়তের দৃষ্টিতে মাসলিহাত বা কল্যাণের অর্থ

উসূলশাস্ত্রবিদগণ মাসলিহাত-এর সংগা ও উদ্দেশ্য নির্ণয় প্রসংগে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ তার সংগার ক্ষেত্রে উপকারে পৌঁছিয়ে দেয় যে কারণ তা নিয়ে কথা বলেছেন। কেউ স্বয়ং প্রযোজ্য কারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। মাসলিহাতের তাৎপর্য বিভিন্নমুখী হওয়ায় শব্দটির সংগা ও উদ্দেশ্য বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম গাযালীর অভিমত

ইমাম গাযালীর মতে উপকার সাধন তা অপকার প্রতিরোধ করা প্রকৃতপক্ষে মাসলিহাত। মসলিহাতের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসংগে তিনি বলেছেন : আমরা একথা বলছি না যে, উপকার সাধন বা অপকার প্রতিরোধ করা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য সৃষ্টির উপকার করা জরুরী। বরং মাসলিহাত বলতে আমরা বুঝি এর সাহায্যে শরীয়তের উদ্দেশ্যের হেফাজত করা। সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে ৫টি। দীন, প্রাণ, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদের হেফাজত করা। এ ৫টি জিনিসের হেফাজতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয়ই হচ্ছে মাসলিহাত বা কল্যাণকর আর এগুলো রক্ষায় অনুপযোগী প্রতিটি জিনিসই অনিষ্টকর। অনিষ্টকর বিষয় প্রতিরোধ করাই কল্যাণ। কিয়াসের সূত্র ধরে যখন আমরা কল্পিত বা যথার্থ অর্থ প্রয়োগ করি তখন এর মাধ্যমে আমরা এ ধরনের উদ্দেশ্য গ্রহণ করে থাকি।[৩৪]

তিনি অন্যত্র বলেছেন : শব্দটি কখনো উপকার সাধন এবং কখনো অপকার প্রতিরোধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ অপকার বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং প্রতিরোধ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা। মোটকথা অনিষ্টকর জিনিস পরিহার করা, প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং যথোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা তথা আইন প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল পদ্ধতি অবলম্বন করা মাসলিহাত-এর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য বর্জিত কোনো পদক্ষেপ যথার্থ হতে পারে না।[৩৫]

ইমাম গাযালীর র. মতে, আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করাই মূলত মাসলিহাত। আর আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপরোক্ত প্রয়োজনীয় ৫টি জিনিসের হেফাজতের মাধ্যমে সৃষ্টি জগতের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা।

খাওয়ারযিমীর মত

মাসলিহাতের তাৎপর্য ব্যক্ত করে এর সংগা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম গাযালীর সাথে একমত। তবে পরোক্ষ অর্থ এবং বাক্যের বাহ্যিক চেহারা অনুযায়ী তার পরিসর সংকীর্ণ করার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন : 'মাসলিহাত হলো, সৃষ্টি থেকে অনিষ্টকর বিষয় দূর করে দিয়ে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের হেফাজত করা।' ইমাম গাযালীর মতের সাথে এ মতের তুলনা করলে আমরা দেখি, অর্থের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে ঐক্য আছে। কারণ অনিষ্টকর বিষয় দূর করার মাধ্যমে সৃষ্টির অবশ্যই উপকার করা যায়। যেমন কল্যাণকর বিষয়কে সরিয়ে দিলে অকল্যাণ আসতে বাধ্য। কারণ কল্যাণ ও অকল্যাণ পরস্পর বিপরীতধর্মী। একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটির উপস্থিতি অনিবার্য। ব্যভিচার হত্যা, মদপান ইত্যাকার অনিষ্টকর কাজ থেকে দূরে থাকলে সেখানে মাসলিহাত অর্থাৎ কল্যাণ হবেই। অনিষ্টকর কাজ দমন করার মাধ্যমে যখন কল্যাণ করা সম্ভব তখন কল্যাণকর কাজ করার মাধ্যমে উপকার লাভ করা আরো সহজ ও প্রত্যাশিত। খারেজীগণ এ তত্ত্বের ভিত্তিতেই দুটি অবস্থার মধ্য থেকে কেবলমাত্র একটি অবস্থার উপর নির্ভর করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. লিসানুল আরব, ১১ খণ্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা, বাইরুত থেকে প্রকাশিত, তাজুল উরুস, ৮ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।
২. সাদউদ্দীন তাফতাযানী, শারহুল খাইসী আলাত তাহযীব, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাশিয়াতুস সিবান আলা শারহিল মালবী আলাস সালাম, ১৩৯ পৃষ্ঠা।
৩. মুহাম্মদ শিবলী, তা'লীমুল আহকাম, ৯৫ পৃষ্ঠা।
৪. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ৩ পৃষ্ঠা।
৫. শিফাউল গালীল, ১০ পৃষ্ঠা, ডক্টর হামদ উবাইদ আল কইসীর তথ্যানুসন্ধান, রিসালাহ দাকতুরাহ।
৬. দাওয়াবিতুল মাসালিহাহ, ৩৩০ পৃষ্ঠা।
৭. আল মুসতাসফা, ২ খণ্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা, উসুলুল ফিকহ, যাবিউদ্দীন শাবান, ১৩০ পৃষ্ঠা।
৮. মাকতাবা আযহার সংকলিত ৯১৩ নং আল বুরহান।
৯. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ।
১০. আল মাওয়াফিকাত ২ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা, আল ফিকরুস সামী ২ খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠা।

১১. তাবকাতুশ শাফেয়ীয়া, সাবাকী, ২ খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা, ইবনুন নাদীম, আল ফিহরিসত, ৩১৮ পৃষ্ঠা, যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ২ খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা, শাহরিস্তানী, আল মিলাল ওয়ান নিহাল ১ খণ্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা, মুহাদারাহ, শায়খ আবদুল গণী আল দাউদ যাহেরী।

১২. জামউল জাওয়ামে, ২ খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা।

১৩. যাহবী, মীযানুল ইতিদাল, ১ খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা, আল ইলাম ১ খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা।

১৪. ড. হামদ উবাইদ আল কাইসী, মাবাহিছুত তা'লীল ৬ পৃষ্ঠা।

১৫. আসসারাখসী, ২ খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুব সংকলিত বাহারুল মুহীত, ৪৮৩ নং, কাযী আবদুল জাব্বার, আল মগান্নীম ১৭ খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, ইবনুল হুসাইনী আল বসরী, আল মুতমাদ, ২ খণ্ড, ৭২৪-৭২৫, ৭৪৫-৭৪৮ পৃষ্ঠা।

১৬. হাল্লী, আত তাহযীব, ৩০৪-৩০০ পৃষ্ঠা, আসলুশ শরীআহ্ ওয়া উসূলুহা, ১২০ পৃষ্ঠা, আল মাবদিউল আম্মাহ লিল ফিকরিল জাফরী, ২৯০ পৃষ্ঠা।

১৭. তুসী, আল ইদ্দাহ, ৮৬ পৃষ্ঠায়, হাল্লী, আততাহযীব, ৩০২ পৃষ্ঠা, আসলুশ শরীআহ ওয়া উসূলুহা, ১১৮ পৃষ্ঠা।

১৯. শাহারিসতানী, আল মিলাল ওয়ান নিহাল এবং সাইসও সাবাকী, তারীখুত তাশরী, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

২০. আসলুশ শরীআহ ওয়া উসূলুহা, ১২০-১২১ পৃষ্ঠা, ড. হামদ উবাইদ আল কাইসী, মাবাহিসুত তালীল, ১ খণ্ড, দিরাসাতুল আম্মাহ।

২১. আসলুশ শরীআহ, ১২১ পৃষ্ঠা।

২২. হাল্লী, আত তাহযীব, ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠা, তুসী, আল ইদ্দাহ ১১৭ পৃষ্ঠা, উস্তায শাইখ আবদুল গনীর উসূলে ফিকহে ভালো ও মন্দের আলোচনা, ৬১-৬৫ পৃষ্ঠা।

২৩. কাশফুল আসরার আলা উসূলিল বায়দাবী, ৩ খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা, ৩ খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা, সদরুশ শারীয়াত ওয়াত তাফতাযানী, শারহুত তালবীহ আলাত তানকীহ, ২ খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা, ইলামুল মুকিয়ীন, ২ খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা, তাকবীমুল আদিল্লাহ, ৬০০ পৃষ্ঠা, আল বাহরুল মুহীত, ৩ খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা, ইবনে ইসহাক, নুযহাতুল মুশতাক তাবেহুল লাময়ে, ৭০৫ পৃষ্ঠা।

২৪. কাশফুল আসরার, ৩ খণ্ড, ২৯৫-২৯৬ পৃষ্ঠা এবং আত তালবীহ, ২ খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা।

২৫. কাশফুল আসরার, ৩ খণ্ড, ২৯৫-২৯৬ পৃষ্ঠা এবং আত তালবীহ, ২ খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা।

২৬. কাশফুল আসরার, ৩ খণ্ড, ২৯৫-২৯৬ পৃষ্ঠা এবং আত তালবীহ, ২ খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা।

২৭. ইবনে হাযম, কিতাবুল আহকাম, ১১৩০ পৃষ্ঠা, নুযহাতুল মুশতাক, ৭০৫ পৃষ্ঠা।

২৮. জামউল জাওয়ামে শারাহ সহকারে, ২ খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা।

২৯. আমাদী, আল আহকাম, ৪ খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা।

৩০. তালীলুল আহকাম, ১৩ পৃষ্ঠা, ড. হামদ উবাইদ আল কাইসী!

৩১. ঐ এবং আল জামউল জাওয়ামে আত্তারের হাশিয়া সহকারে, ২ খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা।

৩২. জামউল জাওয়ামে, ২ খণ্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা, আল মাহসূল, ৩ খণ্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, মাকতাবা আযহার সংকলিত ২১৪৭ নং দলিল, আল তাসনবী, ৩ খণ্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।

৩৩. কাশফুল আসরার, ৩ খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা এবং ৪ খণ্ড, ১৭১-১৭২ পৃষ্ঠা।

৩৪. শিফাউল গালীল, ১০২ পৃষ্ঠা এবং আলমুসতাসফা, ১ম খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা।

৩৫. শিফাউল গালীল, ১ খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা।

গত সংখ্যার গ্রন্থপঞ্জি

৯৬. ইলামুল মুকিয়ীন, ২ খণ্ড, ৬-৯ পৃষ্ঠা।

৯৭. আর রিসালাহ, ৩৯ পৃষ্ঠা, আহমদ মুহাম্মদ শাকেরের তথ্যানুসন্ধান।

৯৮. আর রিসালাহ, আহমদ মুহাম্মদ শাকেরের তথ্যানুসন্ধান, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা।

৯৯. ইলামুল মুকিয়ীন, ১ খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, আহমদ আবদুর রহীম দেহলবী শাফেয়ী (মৃত্যু ১১৮০ হিঃ), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

১০০. 'আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা।

১০১. সূরা আল আনফাল, ৬ আয়াত।

১০২. সূরা আন নূর, ২০ আয়াত।

১০৩. সূরা আল আহযাব, ৫৩ আয়াত।

১০৪. সূরা আন নূর, ২৮ আয়াত।

১০৫. সূরা আন নূর, ৩১ আয়াত।

১০৬. সূরা আল আহযাব, ৩২ আয়াত।

১০৭. সূরা আল মায়েদাহ, ৯০-৯১ আয়াত।

১০৮. সূরা আল হাশর, ৭ আয়াত।

১০৯. উমদাতুল কারী, ১ খণ্ড ৫০১ পৃষ্ঠা, শওকানী, নাইলুল আওতার, ৩ খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা।

১১০. আল ইলালুল বায়েছ আলাল আমরি বিত তাখফীর, যেমন আদ দুউফ জয়াস সিকাম ওয়াল কিবার ওয়াল হাজাহ ওয়াল ইশতিগালু খাতেরুল আমিস সাবিয়্যু বিরুকায়িত ওয়া গায়রু যালিক।

১১১. ইমাম মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে।

১১২. বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ এবং শওকানী, নাইলুল আওতার।

১১৩. নাইলু আওতার, ৬ খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা।

১১৪. কাওয়ায়েদুল আহকাম, ২ খণ্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, আল মাওয়াফিকাত, ১ খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা।

১১৫. ইবনে মাজাহ ও আসহাবুস সুনান।

১১৫ ক. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২ খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা, দারদীরী, আশ শারহুল কবীর, ৩ খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শরীআহ, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা।

১১৬. আহমদ, ইবনে মাজা ও তিরমিযী, শারাউল মাগালিম ১২ পৃষ্ঠা, নাইলুল আওতার, ৫ খণ্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা।
১১৭. নাইলুল আওতার, ৫ খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।
১১৮. নাইলুল আওতার, ৫ খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।
১১৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা, নাইলুল আওতার, ৫ খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা, কাররাফী, আল ফুরুক, ২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।
১২০. আহমদ ও মুসলিম, নাইলুল আওতার, ৬ খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।
১২১. মুহাম্মদ তাহের ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শরীআহ্, ১৫১৭ পৃষ্ঠা।
১২২. তাফসীর আল ফখরুর রাযী, ৩ খণ্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা।
১২৩. বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে নাইলুল আওতারে বর্ণিত।
১২৪. নাইলুল আওতার, ৫ খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, ৫৫ পৃষ্ঠা, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শরীআহ্ ১৬ পৃ.।
১২৫. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২ খণ্ড ১৭৯ পৃষ্ঠা, আল মাওয়াফিকাত ২ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা, ইবনে আশূর, মাকাসিদুশ শরীআহ্, ২ খণ্ড, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা।
১২৬. ইলামুল মুকিয়ীন, ১ খণ্ড, ২৬৫-২৬৬ পৃষ্ঠা।
১২৭. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।
১২৮. সূরা আল মায়েদাহ, ৩ আয়াত।
১২৯. শিফাউল গালীল, ১২২ পৃষ্ঠা এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।
১৩০. শিফাউল গালীল, ১২২ পৃষ্ঠা, কাযী আবদুল জাব্বার, আল মুগনী, ১৭ খণ্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।
১৩১. শিফাউল গালীল, ১২২-২৩ পৃষ্ঠা।
১৩২. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ খণ্ড, ১৩৬-১৪১ পৃষ্ঠা।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা : ৫৯-৬৩

ইসলামে পানি আইন ও বিধিবিধান

মুহাম্মদ নূরুল আমিন

ছয়.

পূর্ববর্তী আলোচনাসমূহে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইসলামে পানি আইনের মূল ভিত্তি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। আল কুরআনে সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'এবং আমি প্রতিটি প্রাণধারী সত্তাকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তা সত্ত্বেও কি তারা ঈমান আনবে না?' আবার সূরা ওয়াকিয়ার ৬৮-৭০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা কি সে পানি সম্পর্কে চিন্তা করেছ যা তোমরা পান কর, তা তোমরা মেঘ থেকে অবতীর্ণ করেছ না আমি তার প্রেরণকারী? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করতে পারি। তা সত্ত্বেও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?'

ইবনে বাত্তালের বর্ণনানুযায়ী মদিনায় ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে রুমা নামক একটি কূপ ছিল। তারা সে কূপের মুখে তালা লাগিয়ে রাখতো। ফলে মুসলমানরা তা থেকে পানি পান করতে পারতেন না। হযরত উসমান রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস অনুযায়ী নবী করিম স. বলেছেন, 'এমন কে আছে যে রুমা কূপটি খরিদ করবে এবং তাতে বালতি দ্বারা পানি উত্তোলনের অধিকার তার ততটুকুই থাকবে যতটুকু সাধারণ মুসলমানের থাকবে। অর্থাৎ কূপটি খরিদ করে সাধারণ মানুষের জন্য ওয়াকফ করে দিবে। এর পর হযরত উসমান রা. কূপটি খরিদ করে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। মানুষকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে নদীনালার পানি আটকানো ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক আনসারী নবী স. এর নিকট যুবায়েরের বিরুদ্ধে হাররার নহরের পানি সম্বন্ধে নালিশ করলো যেখান থেকে খেজুর বাগানে পানি সেচ দেয়া হতো। আনসারী বললো, নহরের পানি প্রবাহিত হতে দাও। কিন্তু যুবায়ের রা. অস্বীকার করলেন। এই নিয়ে তারা নবী স. এর সামনে কথা কাটাকাটি করলে নবী স. যুবায়েরকে বললেন, হে যুবায়ের, জমিতে পানি সেচ করার পর তা তোমার প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও। এতে আনসারী ক্রুদ্ধ হয়ে বললো : সে আপনার ফুফাতো ভাই তাই এরূপ করলেন। একথা শুনে রসূল স.-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, হে যুবায়ের, পানি নিজ জমিতে দেয়ার পর তা দেয়াল পর্যন্ত পৌছলে বন্ধ রাখ। যুবায়ের বললেন, আল্লাহর কসম, আমার মনে হয় এ আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে, 'তোমার প্রভুর কসম, তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে মীমাংসাকারী নিযুক্ত না করে।' (সূরা নিসা ৬৫)

লেখক : সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং গবেষক।

রসূল স. তার সাহাবাদের নিচু জমির আগে উঁচু জমিতে পানি সেচ এবং উঁচু জমির মালিককে পায়ের গিরা পর্যন্ত পানি রাখার নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তিনি নহর তথা নদী নালা খাল বিলের পানির ওপর মানুষ, পশু পাখী, চতুষ্পদ জন্তুর অধিকার সংরক্ষণেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইসলামের পানি আইন ও বিধি বিধান মুসলিম আইনের একটি অপরিহার্য অংগ। আবার মুসলিম আইন সংকলন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ওসমানী শাসনামলে। অর্থাৎ ১৩০০ খৃ. থেকে ১৯২২ খৃ. পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। বলা বাহুল্য এই সময়ে মুসলিম আইন প্রণয়ন ও সংকলনের মূল ভিত্তি ছিল দু'টি : শরিয়া তথা কুরআন ও হাদীস এবং কাওয়ানিন এ হুকুম অর্থাৎ সুলতান ও খলিফাদের জারীকৃত ডিক্রি ও অধ্যাদেশ। ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত এ সমস্ত আইন বলবৎ ছিল। এই বছর মুসলিম আইন সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যা 'তাজিমাত' নামে পরিচিত ছিল। এই সংস্কার করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দুটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এগুলো ছিল, মুসলিম এবং অমুসলিম নীতি বিশ্বাস ও প্রথা প্রতিষ্ঠানের মৌলিক ব্যবধান এবং মুসলিম দেশসমূহের অমুসলিম অধিবাসী এবং বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ও লেনদেনের ভিত্তি নির্ণয়। শরিয়ার মূল নীতিকে অক্ষুণ্ন রেখে মুসলিম শাসকদের এই সংস্কার নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

ওসমানীয় আমলে আইন সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায় ছিল ১৮৫৪ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত। এই সময় দেওয়ানী আইনের (Civil Law) ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয় এবং সংকলিত করা হয় এবং সংকলিত এই আইন মেজেলি বিধি (Mejeelle Code) নামে পরিচিতি লাভ করে। তুর্কী ভাষায় লিখিত এই আইনের বিভিন্ন অংশ ১৮৭০ থেকে ১৮৭৬ সালের মধ্যে জারী হয়। এই আইন ও বিধি বিধানসমূহ ১৬টি পুস্তকে ১৮৫১টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত ছিল। চুক্তি আইন (Law & Contact) ভূসম্পত্তির মালিকানা আইন ও দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের জন্য উল্লেখিত বিধিমালায় স্বতন্ত্র ধারা ছিল।

উপরোক্ত আইনগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শরিয়া ভিত্তিক মুসলিম ধর্মীয় আইনের সংকলন ফৌজদারী আইন ও কার্যবিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে অধিকাংশ মুসলিম দেশে ইউরোপীয় আইনের সাথে সংগতি রেখে ফৌজদারী আইন সংশোধন করা হয় তবে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন বিশেষ করে বিয়ে শাদী, তালাক, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও ওয়াকফ প্রভৃতি শরিয়ার অধীনে রেখে দেয়া হয়।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আইন প্রণেতারা নেপোলিয়ান প্রণীত বিধি বিধানকে ভিত্তি করেই মেজেলি আইন প্রণয়ন করেন। এই প্রক্রিয়ায় তারা ঐ সমস্ত আইনকেই বেছে নেন যেগুলো মুসলিম আইনের সাথে হয় সংগতিশীল নতুবা তার মূলনীতির পরিপন্থী নয় এবং যেগুলো বিদ্যমান সামাজিক চাহিদার আলোকে সহজে গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে তারা ক্ষমতাসীন হানাফী মাযহাবই শুধু নয় অন্যান্য মাযহাবের সাথে সংগতির প্রশ্নটিও খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। এর পর এই আইন ও বিধিবিধানমূহ আরবীতে অনুবাদ করে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সর্বত্র কার্যকর করা হয়। ১৯২২-২৩ সালে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার ফলে আইনের

ধর্মনিরপেক্ষতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। তুরস্কে মেজেলি আইনের প্রয়োগ বন্ধ হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে ১৯২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী একটি নতুন সিভিল কোড জারী করা হয়। পক্ষান্তরে সাবেক ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি আরব দেশে মেজিলি আইনের প্রয়োগ অব্যাহত থাকে।

সংকলন প্রক্রিয়া

মুসলিম দেশসমূহে পানি আইনের সংকলন ঐ সমস্ত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল ছিল। বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে আলজেরিয়া, মরক্কো, তিউনিশিয়া, ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়ায় সর্বপ্রথম লিখিত আকারে পানি আইন ও বিধি বিধান জারী করা হয় এবং যে সময় এই কাজটি করা হয় তখন এই দেশগুলো বৈদেশিক শাসনাধীন ছিল। প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতি সামাল দেয়া এবং জরুরী অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য এই দেশসমূহের শাসক গবর্নররা যে অধ্যাদেশ ডিক্রি ও আদেশাবলী জারী করেছিলেন সেগুলোই এই আইন ও বিধিমালায় স্থান পায়। মুসলিম আইন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় শুরুতে এই বিধি বিধান সমূহে প্রচুর ক্রটি ও ঘাটতি ছিল। কালক্রমে ইসলামী বিধিবিধান যতই স্বচ্ছ হতে থাকে এবং ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ ব্যবহারজনিত সমস্যাবলী যতই বাড়তে থাকে ততই নতুন আইনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে মুসলিম দেশসমূহে পরিবর্তিত অবস্থা মোকাবেলার জন্য পুরাতন আইন সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয় এবং নতুন ভাবে বিধিবিধান, অধ্যাদেশ ডিক্রি, ফরমান ইত্যাদি জারী করা হয়। এ ক্ষেত্রে স্বত্ব নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় :

১. পানির সকল স্বত্ব রাষ্ট্র, সুলতানাত অথবা জনগণের মালিকানায় ন্যাস্ত করা হয় এবং রাষ্ট্র এভাবে মুসলিম সমাজের আসন গ্রহণ করে।

২. উপনিবেশিক আইনে খাবার এবং গবাদি পশুর গোছলের কাজ ছাড়াও পানির সকল প্রকার ব্যবহার অবাধ করে দেয়া হয় এবং এজন্য মূল্য পরিশোধের প্রয়োজন হতো না এবং শরিয়ার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

৩. প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী পানিস্বত্বের জরিপ ও স্বীকৃতি দানের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি ও কমিশন গঠন করা হয়।

৪. নিবন্ধিত ও স্বীকৃত ভূমি ও পানি স্বত্বের লিখিত রেকর্ড সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভূমি রেজিস্টার তৈরি ও সংরক্ষণ।

বলা বাহুল্য ১৮৭০ এর দশকে মেজেলি কোড তথা ওসমনীয় দেওয়ানী আইন জারীর ফলে পানি আইনের সংকলন প্রক্রিয়া কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়।

ওসমানীয় শাসনামলে দেওয়ানী আইন

ওসমানীয় আমলে প্রণীত মেজিলি আইন খিলাফত ব্যবস্থা উঠে যাবার পর তুর্কী প্রজাতন্ত্রে বাতিল করে দেয়া হলেও ঐ সাম্র্যাজ্যের অধীন অনেকগুলো মুসলিম দেশেই এই আইনের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে। এ প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও বাস্তবতার আলোকে এর বিশ্লেষণ হওয়া দরকার।

পানির সংগা

মেজিলি আইনের ১২৩৪ নং অনুচ্ছেদে পানিকে অবিক্রিযোগ্য একটি পণ্য হিসেবে সংগায়িত করা হয়েছে যার ওপর সকল মানুষের অধিকার রয়েছে। এই আইনের ১২৩৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ পানির ও মালিকানা সমাজের ওপর ন্যস্ত। প্রবাহমান পানি যা ভাগাভাগি হয়নি, অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক খননকৃত কুয়ার পানি, সমুদ্র ও হ্রদের পানি প্রভৃতিও এই সংগা অনুযায়ী অবিক্রিযোগ্য এবং সামাজিক সম্পত্তির অংশ (অনুচ্ছেদ ১২৩৬) এই আইন অনুযায়ী নদ-নদী দুশ্রেণীতে বিভক্ত :

১. খাস মালিকানাধীন নদী যার তলদেশ ব্যক্তি মালিকানাধীন নয়।

২. বেসরকারি মালিকানাধীন নদী যা বেসরকারি জমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত।
এই নদীসমূহও আবার দু'ভাগে বিভক্ত :

ক. বেসরকারি মালিকানাধীন নদী যেগুলো একাধিক বেসরকারি জমির ওপর প্রবাহিত হয়েছে কিন্তু সরকারি মালিকনাধীন নদীতে গিয়ে পড়েছে এবং শুকিয়ে গেছে।

খ. ঐ সব নদী নালা যেগুলো বেসরকারি জমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কিন্তু সরকারি নদীতে পড়ার আগে যাদের পানি শুকিয়ে যায়নি।

পানির মালিকানা

দানপত্র, উত্তরাধিকার প্রভৃতির মাধ্যমে পানির মালিকানা অর্জিত হয়ে থাকে। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে এই যে পানির মালিকানা অর্জনের জন্য জমির দখলী স্বত্বও অর্জন করতে হবে।

পানির ব্যবহার

ওসমানীয় বিধিমালায় পানি ব্যবহার সংক্রান্ত দুটি মৌলিক নীতির স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

১. খাওয়া ও পশু গোসল করানোর জন্য পানি : এখানে নীতি হচ্ছে, সরকারি মালিকানা হোক কিংবা বেসরকারি, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যে কেউ এসব নদীর পানি ব্যবহার করতে পারবেন। ওসমানীয় আইনের ১২৬৭ নং অনুচ্ছেদে এই অধিকারকে আরো সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং এতে জীব জন্তুর অধিকারকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তবে শর্ত থাকে যে তাদের সংখ্যা এত বেশি হতে পারবে না যাতে পানির আধার নষ্ট হয়ে যায়। বলা বাহুল্য যদিও পশু গোসল করানোর অধিকার হক্কে চিরব এর অন্তর্ভুক্ত তথাপিও বেসরকারি মালিকানাধীন নদীসমূহের বেলায়ও এই অধিকারকে প্রযোজ্য করা হয়েছে। বিধিমালার ১২৬৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'যদি কারোর জমিতে প্রাকৃতিক ঝরনাধারা, কুয়া অথবা পানির আধার থাকে তাহলে তিনি পানি নেয়ার উদ্দেশ্যে এবং জমিতে প্রবেশ ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বাধা দিতে পারবেন, 'অবশ্য এখানে শর্তও দেয়া হয়েছে। আশপাশে যদি খাবার উপযোগী পানির কোনও উৎস না থাকে তাহলে তার জমি থেকে তিনি বহিরাগতদের পানি দিতে বাধ্য থাকবেন এবং এজন্য তার জমিতে বহিরাগতদের প্রবেশাধিকারও

থাকবে। পানি যদি বিনামূল্যেও প্রদান করা না হয় তাহলে পানি নিতে ইচ্ছুক বহিরাগত ব্যক্তিরা এই শর্তে জমিতে প্রবেশ করতে পারবেন যে তারা কুয়ার রীম অথবা নালার আইল নষ্ট করবেন না।

সেচের জন্য পানি

ক. সরকারি সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত নদী, নালা, খাল বিল, হ্রদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেহেতু পানি একটি সরকারি পণ্য সেহেতু সেচের কাজে তা ব্যবহারের অধিকার সকলেরই রয়েছে তবে শর্ত হচ্ছে, এর ফলে তৃতীয় কোনও পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারবে না। এই আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। সরকার বা কোনও কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে সেচ নালা, গর্ত বা জলাশয় ও পাম্পিং স্থাপনা তৈরি করে দিতে পারেন। তবে তারা এমন কিছু করতে পারবেন না যার ফলে বন্যা দেখা দিতে পারে, নদীর পানি শুকিয়ে যায় অথবা তার স্তর নীচে নেমে যায় কিংবা নৌকা চলাচল ব্যাহত হয়। এ ধরনের স্থাপনা জনস্বার্থ বিরোধী।

খ. আইনের ১২৬৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি মালিকানাধীন নদী নালা বা জলপথের ব্যবহার উজানের ভূমি মালিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পানি প্রবাহের গতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রধান সেচ নালা থেকে পানি প্রত্যাহারকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা এর ফলে ভাটির কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানি প্রত্যাহার ও গতি পরিবর্তন যদি করতে হয় তাহলে উজান ও ভাটি উভয় অঞ্চলের স্বার্থকে সামনে রেখেই করতে হবে। তবে যেহেতু জলপথের মালিক উজানের বেসরকারি কোনও ব্যক্তি সেহেতু মালিক যদি উজানের কৃষকদের সাথে ফয়সালা করে কোনও চুক্তিতে পৌছতে চান তাহলে তিনি তা করতে পারেন যদিও আইন এককভাবে যে কোনও সময়ে তাকে এই চুক্তি বাতিলের ক্ষমতা দিয়েছে।

পানি স্বত্বের বিক্রয়

ওসমানীয় আইনের ২১৬ অনুচ্ছেদে চলাচলের রাস্তা ও জলপথের স্বত্ব, সেচ স্বত্ব Graistinal Low'র মাধ্যমে পানির স্বত্ব বিক্রির অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং তা জমি বিক্রির অংশ হিসেবে গণ্য হয়।

আবার যদি কোনও বাগানের মালিক কোনও নির্দিষ্ট নদী বা খাল থেকে পানি উত্তোলনের স্বত্বসহ যদি তার জমি বিক্রি করে দেন তাহলে আইনের ১০১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঐ নদী বা খালের পানি ব্যবহারের অধিকার প্রাপ্ত তৃতীয় পক্ষগুলো Pre-emytuin right অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা পাবেন। জমির মালিক পানির স্বত্ব ছাড়া শুধু জমিও বিক্রি করতে পারেন।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা : ৬৪-৭৫

ইসলামী দণ্ডবিধি

ড. আবদুল আযীয আমের

॥ এগারো ॥

জখম (আল-জিরাহাত)

ইতোপূর্বে আমরা শিজাজ তথা মাথার বিভিন্ন ধরনের জখম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ পর্যায়ে আমরা মাথা ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশের জখম সম্পর্কে আলোচনা করবো। ফকীহগণ সব ধরনের জখমকেই জিরাহ বলে অভিহিত করেন। যে আঘাতে শরীরের কোন অংশ সম্পূর্ণ কাটা পড়ে না অথবা সম্পূর্ণভাবে কোন অংগ বিকল বা অকার্যকর হয় না এবং যে আঘাত শিজাজ-এর আওতায় পড়ে না ফকীহগণের দৃষ্টিতে তাই 'জিরাহাত'। বস্তুত মাথা ও মুখমণ্ডল ছাড়া মানবদেহের যে কোন অংশের জখমকেই জিরাহাত বলা হয়। কেননা, আরবী ভাষায় 'জারহ' শব্দ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১]

জখম দুই প্রকার

১. এমন জখম যা শরীরের গভীরে পৌঁছে যায় তাকে ফিকহের পরিভাষায় 'জাইফা' বলা হয়। ফিকহের দৃষ্টিতে জাইফা এমন ধরনের জখম যা শরীরের গভীরে (Alimentary Canal) পৌঁছে যায়। কোন কোন ফকীহ যেসব জখম শরীরের গভীরে পৌঁছে যায় তথা জাইফার পর্যায়ভুক্ত সেগুলো নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন, বুক, পেট, পিঠ, উরু, লজ্জাস্থানের মধ্যবর্তী জায়গা ইত্যাদি। কোন কোন ফকীহ গলার শেষভাগ এবং নিতম্বকেও জাইফার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো, জখম শরীরের গভীর পর্যন্ত পৌঁছালো কিনা। জখম যদি শরীরের গভীরে পৌঁছে যায় তবে সেটিকে ফিকহের ভাষায় 'জাইফা' বলা হবে।[২] কোন কোন ফকীহ বলেন, উপরোল্লেখিত অংগসমূহেই জায়েফা সীমিত নয়। শরীরের যে কোন আঘাতকেই জায়েফা বলা যাবে যদি সেটি গভীরে পৌঁছে যায়। মাথার আঘাতকেও জায়েফা বলা যায়। সাধারণত গলার নিচ থেকে শরীরের যে কোন অংশের আঘাতকে জায়েফা বলা হয়। অবশ্য মাথার আঘাতে যদি আহত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করে তবে সেটিকে শিজাজই বলা হবে যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি।[৩]

২. জায়েফা পর্যায়ভুক্ত অংগগুলো ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশে যেসব আঘাত হয়ে থাকে এগুলোকে জিরাহাত বা জখমই বলা হয়। তা হাড়ে হোক বা শুধু মাংসপেশীতে হোক অথবা শরীরের কোন অংশের হাড় ভেঙে যাক।

জখমের কিসাস (শাস্তি)

জখমের কিসাস সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা র. সহ অনেক ফকীহর মতে ইচ্ছাকৃত জখমেও কোন ধরনের কিসাস নেই। জখম জায়েফা পর্যায়ভুক্ত হোক বা এর চেয়ে নিম্নতর হোক তাতে কিসাস কার্যকর হবে না। কেননা, জখমে যথার্থ কিসাস কার্যকর করা অসম্ভব। জখমে কিসাস প্রয়োগের বিধান কার্যকরী করলে অপরাধীর উপর জুলুমের সমূহ আশংকা থাকে, কিসাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমন আশংকা-মুক্ত হওয়া জরুরী, অন্যথায় কিসাস প্রয়োগ নিষিদ্ধ। কেননা কিসাসের শাস্তি প্রয়োগের আঘাত ও শাস্তির মধ্যে সমতা থাকা প্রধানতম শর্ত।[৪]

ইমাম শাফেয়ী র. ও ইমাম আহমদ র.সহ ফকীহদের একটি অংশের মতে যে জখম হাড় উন্মুক্ত করে ফেলে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে। যেমন হাতের ঊর্ধ্বাংশ (বাহু), রান, পায়ের নলা কিংবা পায়ের জখম। কেননা কুরআন কারীমের স্পষ্ট ঘোষণা, 'সব ধরনের জখমে কিসাস'। বস্তুত যে সব জখমে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব সেসব ক্ষেত্রে কিসাস অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী র. এর কোন অনুসারী মনে করেন, মাথা ও মুখমণ্ডলের মূদিহাহ্ পর্যায়ের জখমে যেমন নির্দিষ্ট দণ্ড রয়েছে, জখমের ক্ষেত্রে অনুরূপ নির্দিষ্ট দণ্ডের বিধান নেই। তাদের এই মত ঠিক নয়। কেননা এমত বিশুদ্ধ 'নস' তথা দলিলের পরিপন্থী। এ ধরনের আঘাত বা জখমে কোন প্রকার সীমাতিক্রম বা জুলুমের আশংকা ছাড়াই শাস্তি কার্যকর করা যায়। কারণ আঘাত হাড় পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়। হাড় এমন ধরনের একটি সীমা যেখানে গিয়ে কিসাসকে থামিয়ে দেয়া সম্ভব।

বস্তুত এ ধরনের জখমগুলোকে মূদিহাহর বিধানের পর্যায়ে গণ্য করা যায়। মূদিহাহ্ পর্যায়ের মাথা ও চেহারার আঘাতে কিসাসের বিধান শুধু নির্দিষ্ট দণ্ডাদেশ থাকার কারণে সাব্যস্ত হয়নি। চেহারা ও মাথার আঘাত অন্যান্য আঘাতের চেয়ে আহতের জন্যে বেশি অমর্যাদা ও অসম্মানের কারণ ঘটে। সেই সাথে মাথা ও চেহারা মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এজন্যই শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে মাথা ও চেহারায় মূদিহাহ'র চেয়ে বেশি সব ধরনের আঘাতে দণ্ড নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অবশ্য সর্বসম্মতভাবে এসব আঘাতে কিসাস ওয়াজিব বলা হয়নি।[৫]

জখম যদি হাড় পর্যন্ত না পৌছে, যেমন 'জায়েফা', অথবা হাড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তবে তাতে কিসাস সাব্যস্ত হবে না। কারণ এমতাবস্থায় অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বজায় রাখা সম্ভব নাও হতে পারে, যেহেতু আঘাতের নির্দিষ্ট সীমা নেই। আঘাতের সীমারেখা চিহ্নিত না করা অবস্থায় অপরাধের পূর্ণ প্রতিশোধ অসম্ভব। ফলে এক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর হবে না।[৬]

ইমাম মালেক র. বলেন, সব ধরনের জখমেই কিসাস কার্যকর হবে, আঘাত হাড় পর্যন্ত হোক বা না হোক। সেই সাথে আঘাত চামড়া, গোশত, হাড় যেখানেই হোক কিসাস রহিত হবে না। যেমন অপরাধী যদি আহতের শরীরের এক টুকরো গোশত কেটে ফেলে তাতেও কিসাস কার্যকর হবে, যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে আঘাতের গভীরতা ও ব্যাপ্তি পরিমাপ করে ঠিক সেই জায়গায় একই পরিমাণ বদলা নেয়ার অবকাশ থাকে।

ইমাম মালেক র. এর মতে হাড়ের হাশিমা পর্যায়ভুক্ত আঘাতে যদি কিসাস প্রয়োগের অবকাশ থাকে তবে কিসাস কার্যকরী হবে। ঘাড়, রান ও মেরুদণ্ডের হাড় যদি ভেঙে যায় তাতে কিসাস কার্যকর হবে না। কারণ এসব ক্ষেত্রে কিসাস প্রয়োগ করলে অপরাধের চেয়ে অপরাধীর বেশি ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। যদি কিসাস প্রয়োগে সীমা অতিক্রমের ঝুঁকি না থাকে তবে ইমাম মালেক র. এর মতে হাড়ের আঘাতেও কিসাস কার্যকর হবে।

কারো অন্যায় আঘাতে যদি বাহু ভেঙে যায়, অথবা বাজু কিংবা পা, হাতের তালু কিংবা আঙুলের হাড় ভেঙে যায় তবে ইমাম মালেক র. এর মতে কিসাস কার্যকর হবে। শরীরের অন্যান্য অংগের হাড়ের বেলায়ও একই বিধান কার্যকর হবে যদি অপরাধীর জীবনহানির আশংকা না থাকে।

কিসাস কার্যকর করা ঝুঁকিপূর্ণ কিনা এ সিদ্ধান্ত দেবেন একজন অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসক। অভিজ্ঞ কোন চিকিৎসক যদি কোন আঘাতের কিসাস প্রয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মত দেন তবে এক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর হবে না। আর যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ঝুঁকি নেই বলে অভিমত দেন তবে কিসাস কার্যকর হবে।

ইমাম মালেক র. এর মতে কিসাস কার্যকর না হওয়ার মতো অপরাধের একটি 'জায়েফা'। জায়েফা হলো এমন আঘাত যা শরীরের ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এমতাবস্থায় এটিতেও কিসাস প্রয়োগ করলে তাতে জীবনহানির ঝুঁকি থাকে। এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, ইমাম মালেক র. যেসব আঘাতে কিসাস প্রয়োগের পক্ষে সেগুলোর প্রায় সবগুলোই 'জিরাহাত' পর্যায়ে পড়ে। এক. সকল জখমেই রয়েছে কিসাসের দণ্ড। কেননা কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছে, 'সব ধরনের জখমে কিসাস ওয়াজিব।' বস্তুত ইমাম মালেক র. এর মতে এসব জখমে পুরোপুরিই বদলা নেয়া সম্ভব।[৭]

মালেকী মতানুসারীদের মধ্যে ফকীহ ইবনে রুশদ বলেন, ইচ্ছাকৃত আঘাতের জখমের ক্ষেত্রে কিসাসের আয়াত কার্যকরী হবে যদি কিসাস প্রয়োগের অবকাশ থাকে, যদি অপরাধীর মৃত্যু আশংকা না থাকে। ইবনে রুশদ এর এই অভিমতের ভিত্তি রসূল স. এর হাদীস। যে হাদীসে রসূল স. ছামিয়া, মুনাককালাহ এবং জায়েফাতে কিসাস রহিত করেছেন। ইমাম মালিক র. ও অন্যান্য ফকীহগণ যেসব জখমের কিসাস প্রয়োগে জীবনাশংকা রয়েছে এগুলোকে উল্লেখিত তিন প্রকার জখমের সাথে তুলনা করেছেন। কারো ঘাড়ের হাড় ভেঙে যাওয়া, মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যাওয়া, বুক ও রানের হাড় ভেঙে যাওয়াকেও তারা উপরোল্লেখিত তিন প্রকার জখমের সঙ্গে তুলনা করে কিসাস প্রয়োগ না হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন।

জখমের ক্ষেত্রে জরিমানা

সামঞ্জস্যপূর্ণ কিসাস প্রয়োগের যদি অবকাশ না থাকে অথবা কিসাস প্রয়োগের শর্তাদির কোন শর্ত যদি বিদ্যমান না পাওয়া যায় অথবা কিসাসের হকদারদের কেউ যদি কিসাস ক্ষমা করে দেয় কিংবা ভুলবশত যদি কিসাসযোগ্য কোন অপরাধ ঘটে গিয়ে থাকে, তবে এ সকল অবস্থায় কিসাসের পরিবর্তে জরিমানা ধার্য হবে।

আঘাতের তারতম্য অনুসারে জরিমানায়ও তারতম্য হয়ে থাকে। যদি জায়েফা পর্যায়ের আঘাত হয় তবে দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ জরিমানা সাব্যস্ত হবে। কেননা রসূল স. বলেছেন, 'জায়েফাতে' দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ জরিমানা ওয়াজিব। রসূল এ দণ্ডাদেশ ইমরান ইবনে হুসাইন নামে ইয়েমেনবাসীদের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন। জায়েফা জখম যদি শরীর বিদ্ধ করে বেরিয়ে যায় তাহলে সেটিকে দু'টি জায়েফা আঘাত মনে করা হবে এবং তাতে দুই-তৃতীয়াংশ দিয়াত সাব্যস্ত হবে। ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী তথা অধিকাংশ ফকীহ্ এ মত ব্যক্ত করেছেন। কোন কোন শাফেয়ী মতাবলম্বী ফকীহ্ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা জায়েফা শরীর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেলেও একটি আঘাতই গণ্য করেন। কেননা, জায়েফার সংগা হলো শরীরের ভেতরে আঘাত পৌছে যাওয়া। বস্তুত যে জখম শরীরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে সেটি জায়েফার পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ তাঁরা বলেন, যে আঘাত শরীরের বহিরাংশ থেকে ভেতরের দিকে গেছে তাই জায়েফা। আর এই জায়েফার জরিমানা দিয়াতের এক তৃতীয়াংশ। তাই যেটি শরীরের ভেতর থেকে বাইরের দিকে এসেছে সেটি জায়েফা নয় বিধায় ন্যায়সঙ্গত জরিমানা ধার্য করা হবে। জায়েফা না হওয়ার কারণে তাতে জরিমানা নির্দিষ্ট করা যাবে না।

যেসব ফকীহ্ শরীর বিদীর্ণ হওয়া জখমকে দু'টি জায়েফা মনে করেন, তাদের ভিত্তি কয়েকটি দলীল। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব র. বলেন, হযরত আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি একজনকে তীরবিদ্ধ করল। তীরটি লোকটির শরীর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেল। এই ঘটনায় হযরত আবু বকর দুই-তৃতীয়াংশ দিয়াত নির্ধারণ করেন এবং কোন সাহাবী তাঁর এই সিদ্ধান্তে ভিন্নমত প্রকাশ করেননি। ফলে হযরত আবু বকরের সেই সিদ্ধান্ত সাহাবীদের ইজমারূপে গণ্য হয়। অনুরূপ আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতা ও দাদা থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত উমর রা. এ ধরনের ঘটনায় দুই-তৃতীয়াংশ জরিমানা ধার্য করেছিলেন। যে জায়েফা শরীর বিদীর্ণ করে এর মধ্যে এবং ভিন্ন ভিন্ন দু'টি জায়েফার মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। দু'টি ভিন্ন ভিন্ন আঘাত যদি শরীরের ভেতর পর্যন্ত জখম সৃষ্টি করে তা একটি আঘাত, শরীর বিদীর্ণ করার সম পর্যায়ের। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো, জখম শরীরের ভেতর পর্যন্ত পৌছে গেছে কিনা। আঘাতটি কিভাবে হয়েছে, কোন অবস্থায় হয়েছে এটি বিবেচ্য নয়। যেহেতু উভয় আঘাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এক্ষেত্রে আঘাতকালীন অবস্থার বিষয়টি মূল বিবেচ্য বিষয় নয়।[৯]

জায়েফা ছাড়া অন্য কোন ধরনের জখমে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোন জরিমানা নেই। ফলে এ পর্যায়ের সব ধরনের জখমে ন্যায়সঙ্গত জরিমানা বিচারক ধার্য করবেন। ন্যায়সঙ্গত জরিমানা নির্ধারণের বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন দেখা যাবে, ক্ষতস্থান শুকিয়ে ভরাট হয়ে গেছে বটে কিন্তু সেখানে আঘাতের চিহ্ন রয়ে গেছে। ক্ষতস্থান ঠিক হয়ে সেখানে দাগ অবশিষ্ট থাকাটাকে জায়েফার ক্ষেত্রে জরিমানা নির্ধারণের শর্ত বলে ফকীহগণ নির্ধারণ করেছেন।[১০]

মালিকী মাযহাবের কোন ফকীহর অভিমত; ন্যায়সঙ্গত জরিমানার সাথে ওষুধ, চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষার ব্যয়ভারও অপরাধীকে বহন করতে হবে।[১১]

জখম যদি সুস্থ হয়ে ভরাট হয়ে যায়, আহতের শরীরে ক্ষতের কোন দাগ না থাকে, সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে আঘাতকারীর উপর কোন দণ্ড কার্যকরী হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ র. এর মতে কষ্ট ও যন্ত্রণার জন্যে তাতেও উপযুক্ত জরিমানা সাব্যস্ত হবে। ইমাম মুহাম্মদ র. এতে শুধু চিকিৎসকের সম্মানী সাব্যস্ত হবে বলে মত ব্যক্ত করেছেন।[১২]

ইমাম আহমদ র. এর মতে তাতে যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত জরিমানা সাব্যস্ত হবে।[১৩] ইমাম মালিক র. এর মতে তাতে কোন জরিমানা সাব্যস্ত হবে না কিন্তু কোন কোন মালিকী মতাবলম্বী ফকীহর মতে তাতে চিকিৎসক ও ওষুধের মূল্য জরিমানা হিসাবে সাব্যস্ত হবে।[১৪]

কোন আঘাতে যদি আহত ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করে কিন্তু তার দেহে আঘাতের চিহ্ন ও প্রভাব থেকে যায়, এগুলোর মধ্যে কিছু আঘাত এমনও রয়েছে যেগুলোর প্রভাব দীর্ঘদিন আহত ব্যক্তিকে বহন করতে হয় কিংবা সারাজীবনের জন্যে সেই ঘাটতি থেকে যায়, যেমন হাতের তালু, আঙুল, বাজু অথবা আঙুলের হাড় ভেঙে গেলে আহত ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করলেও এসব অঙ্গ পূর্ণ শক্তি ফিরে পায় না।

কোন কোন ফকীহ বলেছেন, ক্ষতস্থান যদি ঠিক হয়ে যায় এবং জখমের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে তবে তাতে নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট কোন প্রকার জরিমানা সাব্যস্ত হবে না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, এ ধরনের আঘাতের ঘটনায় এই মতাবলম্বী ফকীহগণের দৃষ্টিতে অপরাধী কি ধরনের শাস্তির উপযুক্ত হবে? এ প্রশ্নের বিশদ আলোচনা আমরা 'তাযীরী শাস্তির' অধ্যায়ে করবো। সেখানে মানবদেহের বিরুদ্ধে কৃত শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিশদ আলোচনা করা হবে।

ইসলামী আইনে মানবজীবন ও দেহের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের শাস্তি

অপরাধ সংঘটন-৫

ইতোপূর্বে আমরা ইসলামী আইনে মানবজীবন ও দেহের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের, কৃত অপরাধ ইচ্ছায় হোক আর ভুলক্রমে হোক, শাস্তি বর্ণনা করেছি। অতঃপর ইচ্ছাকৃত যেসব অপরাধে কিসাস রহিত হয়ে যায় তাও বর্ণনা করেছি। সেই সাথে অনিচ্ছাকৃত অপরাধে জরিমানা ও দিয়াতের আবশ্যিক হওয়া না হওয়ার বিষয়ও আলোচনা করেছি। উপরের আলোচিত অপরাধের সবগুলো পর্যায়ই ছিল পূর্ণাঙ্গ তথা অপরাধ ঘটে যাওয়ার পরের বিষয়। সেখানে আমরা সংঘটিত অপরাধের কোন পর্যায় নিয়ে আলোচনা করিনি। এ পর্যায়ে আমরা অপরাধ সংঘটনের পূর্বাবস্থা নিয়ে আলোচনা করাটাকে সমীচীন মনে করছি। মনে রাখতে হবে (ATTEMT OF CRIME) অপরাধ সংঘটনের প্রস্তুতির বিষয়টি সর্বাবস্থায় ইচ্ছাকৃত অপরাধ কর্মের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কেননা অনিচ্ছাকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনের প্রস্তুতির বিষয়টিই অবান্তর। অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অপরাধীর মনে অপরাধ ঘটানোর চিন্তা ক্রিয়াশীল থাকে, যে চিন্তা সে বাস্তবায়নে সচেষ্ট

হয়। আর এমনটি তখনই ঘটে যখন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ ঘটাতে চায়। এক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা কেবল ইচ্ছাকৃত ও অসম্পূর্ণ তথা অসম্পাদিত অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

অপরাধকর্মের দু'টি পর্যায় : প্রথমত চিন্তা করা, দ্বিতীয়ত সেই চিন্তা অনুযায়ী অপরাধের প্রস্তুতি নেয়া

ইসলামী আইন শুধু অপরাধের চিন্তা ও পরিকল্পনা করার কারণে কাউকে শাস্তি দেয় না যতক্ষণ না কেউ চিন্তা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী অপরাধ সংঘটনের জন্য কোন পদক্ষেপ নেয়। ইসলামী আইন অপরাধ সংঘটনের প্রস্তুতির জন্যেও কোন দণ্ডারোপ করে না। অপরাধ সংঘটনের এ পর্যায়ে অপরাধ ঘটানোর জন্যে কোন পদক্ষেপ নেয়া শাস্তি প্রয়োগের জন্যে জরুরী। যেমন কেউ কাউকে হত্যার জন্য অস্ত্র তাক করল কিংবা কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার জন্যে অস্ত্র উত্তোলন করল অথবা ছোরা বা লাঠি দিয়ে আঘাতের চেষ্টা করল। কেননা রসূল স. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের সকল মন্দ চিন্তা ক্ষমা করে দেন যেসব মন্দ চিন্তা মানুষ মনে পোষণ করে এবং যতোক্ষণ তারা চিন্তা বা সংকল্পকে কর্মে পরিণত না করে অথবা মুখে তা ব্যক্ত না করে।[১৫]

অপরাধের প্রস্তুতির কারণে কাউকে এজন্য শাস্তি দেয়া যাবে না, কারণ কেউ অপরাধের প্রস্তুতি নিলেই যে সে অপরাধ ঘটাবে এমনটি নিশ্চিত নয়। হতে পারে লোকটির এই প্রস্তুতি কোন নিরপরাধ কাজের জন্য করেছে। যদি প্রস্তুতির সার্বিক দিক বিবেচনায় বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, লোকটি অপরাধ সংঘটনের জন্য তৈরি হচ্ছিল তবুও তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কারণ এই প্রস্তুতি অপরাধ কর্ম সম্পাদিত হওয়াকে নিশ্চিত করে না। কেননা তার প্রস্তুতি ও অপরাধ সম্পাদনের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকে, এর মধ্যে পরিস্থিতি ও মানসিকতা সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে এবং লোকটি অপরাধের চিন্তা থেকে ফিরে আসতে পারে।

অপরাধ সংঘটনের পদক্ষেপ

অপরাধের সংকল্প ও পরিকল্পনা করার পর যদি অপরাধী অপরাধ সংঘটনে সুনির্দিষ্ট এমন পদক্ষেপ নেয় যাকে অপরাধের সূচনা মনে করা যায়, তবে তার এই সংকল্প অন্যায়রূপে প্রতিফলিত হয়ে গেল। এতে সংকল্পকারীর অপরাধ প্রবণতা বাস্তবে প্রতিফলিত হলো। এমতাবস্থায় সে যদি অপরাধ সংঘটনে কৃতকার্য না হয় তবুও সে শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। কারণ রসূল স. বলেছেন, 'দু'জন মুসলমান যদি একে অন্যের প্রতি তরবারি উত্তোলন করে এমতাবস্থায় নিহত ও হত্যাকারী উভয়ই জাহান্নামী হবে।' অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 'এক মুসলমান যদি অপর মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তবে তাদের উভয়েই জাহান্নামের পাড়ে অবস্থান নেয়। তাদের একজন যদি অপরজনকে হত্যা করে তবে উভয়েই জাহান্নামে প্রবেশ করে।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, দু'জনের একজন তো নিহত হলো, সে জাহান্নামী হবে কেন? রসূল স. বলেন, সেও তো তার ভাইকে হত্যা করার জন্যে উদ্যত হয়েছিল।[১৬]

এ হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা গেল, নিহত ব্যক্তিও হত্যাকারীকে হত্যা করার জন্যে উদ্যত হয়েছিল যদিও সে সুযোগ পায়নি সেও জাহান্নামী হবে। আরো বোঝা গেল, সে স্বধর্মী এক ভাইকে

হত্যার সংকল্প করেছিল এবং সংকল্প বাস্তবায়নে সে হাতিয়ারও ধারণ করেছিল। কোন অপরাধের ক্ষেত্রে অস্ত্র উত্তোলন করা অপরাধের সূচনা। এই সূচনা পর্বের পর সে ইপ্সিত ব্যক্তিকে হত্যাও করতে পারতো। কিন্তু তাতে সে সফল হয়নি কিংবা আঘাত করলেও আহত ব্যক্তি চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে গেছে। অথবা হত্যাকারী তার চূড়ান্ত আঘাত হানার আগেই ইপ্সিত ব্যক্তি পাল্টা আঘাত হানে কিংবা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। বস্তুত উপরে বর্ণিত ইত্যাকার সব অবস্থাই প্রমাণ করে অপরাধী হত্যাকাণ্ড ঘটাতেই এসব পদক্ষেপ নিয়েছিল কিন্তু অন্য কারণে সে তার উদ্যোগে সফল হয়নি। তার এই ব্যর্থতা সংকল্প পরিত্যাগ কিংবা হত্যা পরিকল্পনা থেকে পিছু হটার কারণে হয়নি, বরং অপরাধী ব্যর্থ হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। ফলে সে অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

কেউ যদি কাউকে হত্যার উদ্দেশে গুলী চালায় এবং ইপ্সিত ব্যক্তি সেই গুলীতে আহত হয়, অথবা অন্য কোন অস্ত্র দিয়ে কাউকে হত্যা করার উদ্দেশে আঘাত করে এবং সেই আঘাতে ইপ্সিত লোকটি আহত হয়, কিন্তু সঠিক চিকিৎসায় আহত উভয় ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠে এমতাবস্থায় আঘাতকারী হত্যা চেষ্টার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। কারণ এক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিদের সুস্থ হয়ে ওঠা আঘাতকারীর হত্যা সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণে হয়নি, বরং যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা নেয়ার কারণে তারা প্রাণে বেঁচে গেছে। বস্তুত এ ধরনের অপরাধে অপরাধী অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। কখনো এমনও ঘটে, কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার জন্য গুলী চালায় কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ইপ্সিত লোকের গায়ে আঘাত লাগে না ফলে ইপ্সিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ অক্ষত থেকে যায়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হোক কিংবা অন্য কোন কারণে হোক নিশ্চিত হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণের কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যাচেষ্টার অপরাধে অপরাধী গণ্য হবে এবং তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো থেকে বিরত থাকা

উপরে বর্ণিত অবস্থাগুলো ছিল ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, অন্য কোন অনিচ্ছাকৃত কারণে হত্যাকারী হত্যকাণ্ডে সফল হয়নি, যে কারণগুলোতে হত্যা চেষ্টাকারীর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যার উদ্দেশে অস্ত্র উত্তোলন করার পর সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকে, এমতবস্থায়ও অভিযুক্তকে শাস্তি দেয়া হবে। প্রথমত, সে হত্যাচেষ্টা করে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ভয় দেখিয়েছে। দ্বিতীয়ত, সে হত্যার ইচ্ছা করেছিল।[১৭]

অবশ্য এক্ষেত্রে এমন মতামতও রয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় হত্যাকাণ্ড থেকে ফিরে এসে থাকে তবে তার শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। যাতে সে এ ধরনের অপরাধকর্ম ঘটানোর ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভ করার সুযোগ পায় এবং নিজের আত্মশক্তিতে এমন অপরাধ থেকে বিরত থাকতে পারে। অভিযুক্তকে এই সুযোগ দিলে আত্মনিয়ন্ত্রণের উপকারিতার বিষয়টি তার কাছে প্রতিভাত ও বোধগম্য হবে।

অপরাধ সংঘটন থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকার এই উপকারিতা আধুনিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য হবে। কেননা, আধুনিক আইনে অপরাধ কর্মের উদ্যোগ ও পদক্ষেপেও প্রায় অপরাধ সম্পাদনের মতোই শাস্তি দেয়া হয়, কিন্তু ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে এ নিয়ম অকার্যকর। প্রচলিত আইনে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধী শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অপরাধ কর্মটি সম্পূর্ণ করে না। কিন্তু কোন অপরাধী যখন জানতে পারে, অপরাধ কর্মটি সম্পাদন না করলেও অপরাধের উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে তাকে মূল অপরাধ কর্মের মতোই শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন আর সে অপরাধ কর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ বোধ করে না। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধের উদ্যোগ বা পদক্ষেপের অপরাধে সম্পাদিত অপরাধের কাছাকাছি বা অনুরূপ শাস্তি প্রদানের বিষয়টি অপরাধ থেকে স্বউদ্যোগে মানুষকে বিরত রাখার নীতি ও কৌশলের পরিপন্থী।

ইসলামী আইন উপরে উল্লেখিত প্রচলিত আইনের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামী আইনে অপরাধ সংঘটনের পদক্ষেপে তা'যিরী শাস্তি হয়ে থাকে। তা'যিরী শাস্তির প্রকৃতি অবস্থা ও পরিস্থিতির ভিন্নতায় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কোন অপরাধ কর্মের পদক্ষেপ নিয়েও অপরাধ করা থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকে তাকে তার অবস্থা অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়। শাস্তি নির্ধারণের সময় তার ব্যক্তিগত তৎপরতা বিবেচনা করা হয়। বস্তুত অপরাধ কর্মের পদক্ষেপের শাস্তি অপরাধ সম্পাদনের শাস্তির চেয়ে অনেক কম। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো, ইসলামী আইন প্রয়োগের সময় অপরাধী অপরাধের প্রতি উৎসাহিত হওয়ার মতো কোন উপাদান থাকে না। প্রচলিত আধুনিক আইনে অপরাধী যখন দেখে, অপরাধের পদক্ষেপ নিয়ে অপরাধ থেকে বিরত থাকলেও তাকে অপরাধ সম্পাদনের মতোই শাস্তি ভোগ করতে হবে তখন অপরাধ থেকে বিরত না থেকে সে অপরাধ সম্পাদনেই প্ররোচণা বোধ করে।

অবশ্য এ বিষয়টি সতসিদ্ধ যে, মূল অপরাধ ঘটানো থেকে যে বিরত থাকে সেও অপরাধের পদক্ষেপ ও সূচনার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। কেননা তার পূর্বাপর তৎপরতা সে যে অপরাধ ঘটাতে চাচ্ছিল তা পরিষ্কার করে দেয়। তাছাড়া একজন হত্যা চেষ্টাকারীর হত্যাচেষ্টা দ্বারা ইপ্সিত ব্যক্তির মধ্যে প্রাণ হারানোর ভয় সৃষ্টি করে, এ কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তা'যিরী শাস্তি থেকে রেহাই দেয়ার কোন অবকাশ নেই।

নিবন্ধকার বলেন, আমার দৃষ্টিতে প্রচলিত আধুনিক দণ্ডবিধির চেয়ে ইসলামী দণ্ডবিধি উত্তম ও বেশি উপযোগী। কারণ ইসলামী আইন অপরাধ সম্পাদনকারী এবং অপরাধের প্রস্তুতি গ্রহণকারীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করে উভয় পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি নির্ধারণ করেছে। কোন কোন অপরাধের প্রস্তুতিও হয় খুবই ভয়ানক, এ পর্যায়টিকে শাস্তির বাইরে রাখা যায় না। অপরাধের প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ নেয়ার পর স্বেচ্ছায় অপরাধ ঘটানো থেকে বিরত থাকলেও অভিযুক্তকে ক্ষমা করা যায় না। কারণ তাতে অনেক গুরুতর অপরাধ থেকেও নিস্কৃতি পাওয়ার অবকাশ সৃষ্টি হবে।

হত্যাকাণ্ড ঘটাতে গিয়ে যদি অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত হয়

অপরাধী হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এমন কোন কর্ম করেছে যার দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনহানি ঘটতে পারতো, কিন্তু কোন কারণে হত্যাকারী নিজ ইচ্ছামত হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করতে পারেনি। এ অবস্থায় হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন না হলেও অপরাধীর আঘাতে আক্রান্ত ব্যক্তির দৈহিক ক্ষতি সাধিত হয়। যেমন আক্রান্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গহানি ঘটে অথবা কোন অঙ্গ মারাত্মকভাবে জখম হয়। এ ধরনের অপরাধে ইসলামী আইনে নির্দিষ্ট শাস্তি (কিসাস) রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি কিসাসের শর্তাদি বিদ্যমান থাকে, তবে কিসাস কার্যকর হবে। যেমন এ ধরনের আক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গ সম্পূর্ণ নষ্ট বা কেটে গেল অথবা বিকল হয়ে গেল অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ কেটে গেল। তবে কোন কারণে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে দিয়াত ধার্য হবে। জরিমানা নির্দিষ্ট পরিমাণও হতে পারে অনির্দিষ্টও হতে পারে। অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তা নির্ণয় করবেন সংশ্লিষ্ট বিচারক।

প্রশ্ন হতে পারে, অপরাধের সূচনা বা পদক্ষেপের জন্যে তা'যিরী শাস্তি দেয়া কি জায়েয?

ইমাম আবু হানিফা র., ইমাম শাফেয়ী র. ও ইমাম আহমদ র. এর মূলনীতি হলো, কোন অপরাধে যদি কিসাস কার্যকরী না হয় সে ক্ষেত্রে দিয়াত বা জরিমানা সাব্যস্ত হবে সেই সাথে তাঁরা তা'যিরী শাস্তি প্রয়োগেরও পক্ষে, যদি সেখানে সাধারণ মানুষের উপকারের প্রশ্ন জড়িত থাকে। অপরদিকে ইমাম মালিক র. কিসাস, দিয়াত ও জরিমানার পাশাপাশি তা'যিরী শাস্তিরও পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কল্যাণ থাকুক বা না থাকুক সেটি ইমাম মালিক র. জরুরী মনে করেননি।[১৮]

নিবন্ধকার বলেন, আমার মতে– ইমাম মালিক র. এর মতানুসারে উপরে উল্লেখিত ইচ্ছাকৃত হত্যাচেষ্টার অপরাধে অন্যান্য শাস্তির সাথে তা'যিরী শাস্তির বিধানও রাখা জরুরী এবং অন্যান্য তা'যিরী শাস্তির চেয়ে এই শাস্তি কঠোর হওয়া উচিত যা একটি পূর্ণাঙ্গ অপরাধের বেলায় প্রয়োগ করা হয়। কেননা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার ইচ্ছা যে কোন সমাজের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। এই অপরাধে এমন কঠোর শাস্তির বিধান করা উচিত।

হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ সংঘটনের পদক্ষেপ গ্রহণের শাস্তি

হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধেও একই বিধান। কারণ এমনটি হতে পারে যে, অপরাধী আক্রান্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেয়ায় ইচ্ছা করেছিল অথবা কোন অঙ্গহানি ঘটানোর সংকল্প করেছিল কিংবা কোন অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্ট করার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু অপরাধী তার সংকল্পে সফল হতে পারেনি। কারণ আক্রান্ত ব্যক্তি যথার্থ চিকিৎসা নিয়ে তার আঘাত সারিয়ে তোলে। ফলে তার জখম ভরাট হয়ে শুকিয়ে যায়, কোন দাগ বা চিহ্ন অবশিষ্ট থাকেনি, সেই সাথে কোন স্থায়ী ক্ষতিরও শিকার হয়নি। এমতাবস্থায় জখম করার অপরাধে তাকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে, কিন্তু তার কৃত অপরাধের চেয়েও মারাত্মক অপরাধের ইচ্ছা পোষণ করায় তাকে আরো কঠোর শাস্তি দেয়াটাই হবে যৌক্তিক।[১৯]

'আলমাবসূত' এ গ্রন্থে প্রসঙ্গে যেসব মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধে তা'যিরী শাস্তি কার্যকর হবে। যেমন- কোন অঙ্গ কেটে ফেলার অপরাধ অথবা কোন অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্ট করে ফেলার অপরাধ কিংবা কোন ক্ষত সৃষ্টি করা কিংবা জখম করার অপরাধ। কারণ এসব আঘাতে বা আক্রমণের শিকার ব্যক্তির কোন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও সে নি:সন্দেহে ভীতসন্ত্রস্ত হয়। এমতাবস্থায় অপরাধীকে লঘু শাস্তিস্বরূপ তা'যিরী শাস্তি দেয়া হবে। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে নিরপরাধ কাউকে ভীতসন্ত্রস্ত করাও অপরাধ।[২০]

মোটকথা; ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা এমন একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেখানে হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না, সবাই সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি-শৃংখলা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে বসবাস করবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৬৯।

২. আল-কাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৮/৩১৯। তাতে লেখা হয়েছে, জায়েফা পর্যায়ের জখমে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত ওয়াজিব হবে। একই কিতাবের ২৯৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, জখম দুই প্রকার (১) জায়েফা (২) এবং যা জায়েফা নয়। জায়েফা হলো, যে জখম শরীরের গভীরে পৌছে যায়। যেসব অঙ্গের জখম শরীরের গভীরে পৌছে সেগুলো হলো, বুক, পিঠ, পেট, পার্শ্বদেশ, প্রজননাঙ্গ ও পায়ূ পথের মধ্যবর্তী জায়গা। হাত পা, গলা, ঘাড় ইত্যাদিতে জায়েফা পর্যায়ের জখম হতে পারে না। কারণ এসব জখম পেট পর্যন্ত পৌছে না। ইমাম আবু ইউসুফ র. থেকে একটি উক্তি এমনও রয়েছে যে, জায়েফার নির্ধারিত অঙ্গগুলো ছাড়াও যদি অন্যান্য অঙ্গের জখম এমন হয় যে, যেগুলোতে তরল ওষুধ প্রয়োগ করলে তা পেট পর্যন্ত পৌছে যায় তবে তাও জায়েফা পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা, জখম যদি শরীরের গভীর পর্যন্ত না পৌছে থাকে তবে তাতে দেয়া ওষুধ শরীরের গভীরে কিভাবে যাবে? আল-মুহাযযাব আশ-শীরাজী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১৪-তে লেখা হয়েছে, জায়েফা এমন জখম যা পেট, পিঠ, বুক নিতম্ব ও গলার কোণা দিয়ে শরীরের গভীর পর্যন্ত পৌছে যায়। আত-তাজ ওয়াল-আকলি আল-মুখতাসার, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৭, আশ-শারহুল কবীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১২৮।

৩. তাবঈনুল হাকায়েক শরহে আল-কানয, ইমাম যাইলাঈ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩৩। তাতে লেখা হয়েছে, তা মাথা ও পিঠ উভয় জায়গায় হতে পারে। কিন্তু যেসব জখম শিজাজের পর্যায়ভুক্ত সেগুলো শুধু মাথা ও চেহারাতেই হয়ে থাকে। কোন কোন ফকীহ বলেন, জায়েফা গলার উপরে হয় না।

৪. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০৯। তাতে লেখা হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যু থেকে বেঁচে যায় তাহলে এগুলোর কোনটিতেই কিসাস কার্যকর হবে না। জখম জয়েফা হোক বা না হোক এমতাবস্থায় সেগুলোতে যথার্থ কিসাস কার্যকরী সম্ভব নয়।

৫. আল মুহাযযাব, আশশিরাজী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৯০; আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা ২৬২; আশশারহুল কবীর খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৬০। শারহুল কবীরে লেখা হয়েছে, জখম যখন

হাড় পর্যন্ত পৌছে যায় যদি তা চেহারা ও মাথা ছাড়া অন্য অঙ্গ, যেমন উর্ধ্ব বাহু, রান বা পায়ের নলাতে হয়ে থাকে তবে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে। হানাফী মাযহাবের অনেক আলেম মনে করেন, তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। এ ধরনের জখম মাথা ও চেহারার ক্ষেত্রে মূদিহাহ' থেকে জরিমানার ভিন্নতা রাখে তদ্রূপ কিসাসের ক্ষেত্রেও ভিন্ন হবে। কিন্তু প্রমাণিত ও সঠিক মতামত হলো, এসব ক্ষেত্রে যেহেতু কিসাস কার্যকরী করা সম্ভব তাই তাতে কিসাস কার্যকর হবে। এসব জখমে কোন প্রকার সীমালংঘন ছাড়াই শাস্তি প্রয়োগ সম্ভব। কারণ জখমের চূড়ান্ত সীমানা জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট থাকে তাই মাথা ও চেহারার মূদিহাহ আঘাতের মতো এক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকর হবে।

৬. আল মুহাযযাব, আশশীরাজী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৯০। তাতে লেখা হয়েছে, প্রথমে জখম পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আঘাত যদি হাড় পর্যন্ত না পৌছে থাকে, যেমন জায়েফা পর্যায়ের আঘাত, কিংবা হাড় ভেঙে গিয়ে থাকে, যেমন বাহুর উর্ধাংশে হাড় ভেঙে যায় তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। কেননা শাস্তির মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। এতে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে না যে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার সীমালংঘন করবে কিনা। বস্তুত এতে কিসাস রহিত হয়ে যাবে।

৭. মাওয়াহিবুল জলীল খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৭; আততাজ ওয়াল আকলী আল মুখতাসার আল খলীল পৃষ্ঠা ২৪৬, এ কিতাবটি উপরে উল্লেখিত কিতাবের হাশিয়ায় ছাপা হয়েছে।

৮. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৩১।

৯. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪১৮/৪১৯। তাতে লেখা হয়েছে, জায়েফা যদি শরীর বিদীর্ণ করে ফেলে তবে তাতে দুই-তৃতীয়াংশ দিয়াত ওয়াজিব হবে। এই মতের উপর সাহাবাদের সর্বসম্মত অভিমত (ইজমা) রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর রা. এর অনুরূপ একটি ফয়সালার ব্যাপারে কোন ভিন্নমত প্রকাশ করেননি। হাশিয়া আদদাসুকী আলা শারহে আদদারদির খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১২; আলমুহাযযাব, আশশীরাজী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৪; আশশারহুল কবীর খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬২৯/৬৩০।

১০. আলকাসানী, খণ্ড ৭ পৃষ্ঠা ৩২০। তাতে লেখা হয়েছে, শরীরের যেসব জখম ভরাট হয়ে যায় এবং জখমের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে, তাতে ন্যায়সঙ্গত জরিমানা ধার্য হবে। ৩২৪ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, জায়েফা ছাড়া অন্য কোন জখমে যদি ক্ষত ভরাট হয়ে যায় কিন্তু আঘাতের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, তাতেও ন্যায়সংগত জরিমানা ধার্য হবে। হাশিয়া আদদাসুকী শরহে আলা আদদারদীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১৬; মাওয়াহিবুল জলীল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৭; আততাজ ওয়াল আকলীল মুখতাসার আল খলীল, পৃষ্ঠা ২৪৬; আল মুহাযযাব আশশীরাজী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৪; আশশারহুল কবীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬৩৮।

১১. হাশিয়া আদদাসুকী আলা শরহে আদ দারদীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১৬, তাতে লেখা হয়েছে, ইবনে আরাফাহ ডাক্তারের সম্মানী ও ওষুধের মূল্য পরিশোধ করার জন্যে অপরাধীকে বাধ্য করাকে সমর্থন করেন। অবশ্য এমনটি তখনই সম্ভব যখন ক্ষতস্থান সুস্থ হয়ে গিয়ে সেখানে আঘাতের

চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হয় যে, এই আঘাতের শরীয়তে জরিমানা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে, তবে ক্ষতস্থান ঠিক হয়ে দাগ অবশিষ্ট থাক বা না থাক তাতে শরীয়ত নির্ধারিত জরিমানাই ধার্য হবে।

১২. আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২৪, তাতে লেখা হয়েছে, জায়েফা ছাড়া সব ধরনের জখমে যদি কোন দাগ অবশিষ্ট না থাকে তবে ইমাম আবু হানিফা র. এর মতে কোন জরিমানা সাব্যস্ত হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ ব্যাথা ও যন্ত্রণার একটি জরিমানা নির্ধারণ করাকে ওয়াজিব মনে করেন। ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, চিকিৎসকের সম্মানী দেয়া জরুরী।

১৩. আশশারহুল কবীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬৩৭।

১৪. মাওয়াহিবুল জলীল খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৭; আততাজ ওয়া আকলী আল মুখতাসার আল খলীল পৃষ্ঠা ২৪৬। এ কিতাবটি মাওয়াহিব এর হাশিয়াতে ছাপা হয়েছে। হাশিয়া আদদাসুকী আশ শারহে আদদারদীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১৬। হাশিয়া আদদাসুকীতে লেখা হয়েছে, ইবনে আরাফা মনে করেন, ক্ষতস্থান বা আঘাত শুকিয়ে যাওয়ার পর যদি কোন দাগ বা চিহ্ন না থাকে তবু অপরাধীর উপর ডাক্তারের সম্মানী ও ওষুধের খরচ চাপানো উচিত। তবে শর্ত হলো, জখম এমন হতে হবে যাতে শরীয়ত নির্ধারিত কোন জরিমানা নেই।

১৫. তাফসীরে রুহুল মাআনী, আল্লামা আলূসী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫০৮, প্রকাশকাল ১৩০১ হিজরী; সুবুলুস সালাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৬/২১৭ প্রকাশকাল ১৩৫৭ হিঃ, মাতবা ইস্তেকামাহ, কায়রো।

১৬. আযযাওয়াজির আন ইকতিলাফিল কাবাইর, ইবনে হাজার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯২, প্রথম প্রকাশ আলবাবী হালবী, কায়রো ১৩৭০ হিজরী।

১৭. আসসারাখসী খণ্ড ২৪ পৃষ্ঠা ২৭, তাতে লেখা হয়েছে, এক ব্যক্তি কাউকে হত্যার জন্যে তরবারি উত্তোলন করলো কিন্তু সে হত্যা করল না, অথবা কেউ ছুরি বা লাঠি দিয়ে হামলা করতে উদ্যত হলো কিন্তু আঘাত করল না, এমন অপরাধে কি অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হবে? ফকীহগণ বলেন, হাঁ অবশ্যই তাকে শাস্তি দেয়া হবে, কারণ সে নিরপরাধ মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করেছে এবং একজন মানুষকে হত্যার ইচ্ছা করে হারাম কাজ করেছে। আলফাতওয়া আল আসাদিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৮। তাতে লেখা হয়েছে, অপরাধী বিনা কারণে একজন মানুষকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করেছে, পরে যে কোন কারণে সে অস্ত্র প্রয়োগ করেনি। এমতাবস্থায়ও অন্যায় পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে তাকে সতর্ক ও শাসন করার জন্য তা'যিরী শাস্তি দেয়া হবে।

১৮. মাওয়াহিবুল জলীল খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৩৭; আততাশরীউল জিনাঈল ইসলামী, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৭।

১৯. তাবসিরাতুল হুক্কাম, ইবনে ফারহুন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৭; মাওয়াহিবুল জলীল খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা ২৪৭; আততাশরীউল জিনাঈল ইসলামী, পৃষ্ঠা ২৪৬।

২০. আল মাবসূত, আসসারাখসী, খণ্ড ২৪, পৃষ্ঠা ৩২; আলফাতওয়া আল আসাদিয়া খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৮।

অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা : ৭৬-৮৭

ইয়াতিমের অধিকার ও ইসলাম

জাফর আহমাদ

পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় ও স্পর্শকাতর এক মানবতার নাম ইয়াতিম। মানব সমাজের দুর্বল ও অক্ষম এ সদস্যরা যুগ যুগ ধরে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হলেও মানবতার ম্যাগানাকার্টা আল কুরআন এদের গুরুত্ব দিয়েছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায়। মানবতার মহান বন্ধু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স. ছিলেন এদেরই একজন অনন্য সদস্য। বরং তাকে পৃথিবীর এতিমদের সরদার বলা যায়। জন্মের আগেই যার বাবা আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। যিনি জন্মের ছয় বছরের মধ্যে মায়ের অনন্ত ভালাবাসা থেকে বঞ্চিত হন। 'ইয়াতিম নবী' এখানেও রসূল স. এর রাহমাতুল লিল আলামীন বা জগৎবন্ধুর হওয়ার পরিপূর্ণতা পরিস্ফুট হয়েছে। যাতে করে পৃথিবীর কোন ইয়াতিম এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে না পারে যে, আমরাতো বাবা-মায়ের অনন্ত ভালবাসা, মায়া, মমতা, স্নেহ, যত্ন ও আদর কিছুই পাইনি, আমাদের এই দুঃখ কে অনুভব করবে? তাই হয়ত (আল্লাহই ভালো জানেন) মুহাম্মদ স. কে ইয়াতিম করে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহতাআলা বলেন : 'আমি ইয়াতিম পেয়েও কি তোমাকে আশ্রয় দেইনি? তোমাকে পথহারা পেয়েও কি তিনি পথ দেখাননি, তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব পেয়েও ধনী বানাননি? কাজেই ইয়াতিমদের প্রতি কঠোর হয়ো না। প্রার্থীকে তিরস্কার করো না।'[১]

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় দুর্বল ও অসহায় মানবতাকে অধিকার নয়, শুধুমাত্র মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হয়। ফলে এদেরকে সরকারসহ বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন ও দাতাগোষ্ঠীর অনুগ্রহের পাত্র হয়েই বেঁচে থাকতে হয়। সহায়-সম্পদহীন এসব শিশুর অনেকের একমাত্র ঠিকানা হয় অনাথ আশ্রম নামক এক একটি কারাগার। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আশ্রম গুলোকে কারাগার বলা অযৌক্তিক হবে না। সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত অনাথ আশ্রমগুলোর আরো অবস্থা মারাত্মক। কিন্তু ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানবিক চেতনা ছাড়াও এসব অসহায় মানবতার অধিকার সরকারসহ সকলের ওপর বর্তায়। অর্থাৎ পিতা-মাতার বর্তমানে একটি শিশু যতটুকু অধিকার ভোগ করে, একটি অনাথ শিশু ততটুকু অধিকারই ভোগ করার অধিকার রাখে। হয়ত সে বাবার স্নেহের মতো খাঁটি ভালবাসা পাবে না বটে তবুও তাকে বুঝতে দেয়া যাবে না যে সে অনাথ। এ দায়িত্ব বহন করবে সরকার ও ইয়াতিম শিশুটির আত্মীয়-স্বজন। শুধুমাত্র কয়েকটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা

লেখক : জাফর আহমাদ, প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

করে দিলেই সরকার ও সমাজের অধিকার আদায় হয়ে যায় না। এ জন্য সরকার বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসের আলোকে একটি সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করতে পারে।

সরকারিভাবে ইয়াতিমদের কোন আইন না থাকায় এ মানবগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে বড়ই হেলাখেলা করা হয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এমন কিছু পাষণ্ড লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা ইয়াতিমের সাথে নির্মম ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয় না, তার সহায়-সম্পদটুকুও আত্মসাৎ করে। অথচ আল্লাহতাআলা আল-কুরআনে ইয়াতিমের মালকে আগুন বলে উল্লেখ করেছেন। যারা এ আগুন নিয়ে হেলাখেলা করে তাদের বিবেকের কাছে একটি বিষয় এ ভাবে উপস্থাপন করতে চাই যে, আপনি যদি আপনার চক্ষুশীতলকারী আদরের শিশু সন্তানটিকে নিয়ে এভাবে চিন্তা করেন যে, আপনার অনুপস্থিতিতে সে কি কি অভাবের সম্মুখীন হবে। তবেই একজন ইয়াতিমের মর্মস্পর্শী হৃদয়ের অব্যক্ত কান্না আপনার বিবেককে অবশ্যই ব্যথিত করবে। আপনার উপলব্ধির করুণ মর্মবেদনা আপনার চোখকে অশ্রুসিক্ত করবে। একেবারেই ছোট্টবেলায় অথবা জন্মের পূর্বেই পিতা বা মাতা অথবা উভয়কে হারিয়ে যে শিশুটি তাদের অসীম ভালবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত হলো, সেই চির দুঃখী মানবতার সাথে যে ব্যক্তি এ নির্মম ব্যবহার করে তাকে কি মানুষ বলে স্বীকার করবেন? এদের কঠিন হৃদয়ের কাছে আবেদন করি, মনে করুন আপনি পরপারে চলে গেলেন, আপনি সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে, আপনার মতই কোন এক লোক আপনার ইয়াতিম ছেলে-মেয়ের সাথে ঐ একই ব্যবহার করছে কিন্তু আপনি কিছুই করতে পারছেন না, তখন আপনার কেমন লাগবে? ইয়াতিম নির্যাতন ও জুলুমের যে শাস্তির কথা আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে সরকার শাসকবর্গও রেহাই পাবে না। কারণ সরকারের দায়িত্ব ছিল এদের লালন-পালনসহ অন্যান্য অধিকার সংরক্ষণ করা।

ইয়াতিমের পরিচয়

আরবী ইয়াতিম শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নিসঃঙ্গ'। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 'দুররে ইয়াতিম' বা নিসঃঙ্গ মুক্তা বলা হয়ে থাকে।[২] আরবী অভিধানে এ অর্থ ছাড়াও পিতৃহীন, অনাথ, একক, অদ্বিতীয় অতুলনীয়, অনুপম ও বিস্ময় অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় 'ইয়াতিমাতুত দাহরে' যুগের বিস্ময়।

ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে ইয়াতিম বলা হয়। জীব-জন্তুর বেলায় এর বিপরীতভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যে জীব-জন্তুর মা মরে যায় তাকে ইয়াতিম বলে। কেউ পিতৃ-মাতৃহীনকেও ইয়াতিম বলেছেন।[৩]

ছেলে মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামের পরিভাষায় ইয়াতিম বলা হয় না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম বলেছেন : 'বালেগ হবার পর কেউ ইয়াতিম থাকে না।'[৪]

ইয়াতিমদের সাথে সদ্ব্যবহার

সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দৃষ্টিতে যদিও আল-কুরআন পিতামাতাকে সদ্ব্যবহারের অগ্রাধিকার দিয়েছে, কিন্তু সমাজের অক্ষম, দুর্বল ও অসহায় মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার হলো ইয়াতিমগণ। কেননা তাদের মাথায় স্নেহের পরশদানকারী ও লালনপালনকারী দুনিয়াতে বেঁচে নেই। আল্লাহতাআলা বলেন, 'বাপ-মা'র সাথে ভালো ব্যবহার করো। নিকট আত্মীয় ও ইয়াতিম-মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো।[৫] 'বলে দিন, তোমরা কল্যাণার্থে যা কিছু খরচ করো, তার অধিকতর হকদার বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন ইয়াতিমগণ।'[৬] 'তুমি ইয়াতিমকে ধমক দিয়ো না।'[৭] ইয়াতিমের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হবে এ সম্পর্কে আল্লাহতাআলার পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা হলো : 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ইয়াতিমদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে? বল: যে ধরনের কাজে তাদের কল্যাণ হতে পারে, তা অবলম্বন করাও উত্তম। আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজেদের সাথে মিলিয়ে নাও, মনে করবে তারাতো তোমাদের ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী আর কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছে করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।'[৮]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুসলমানদের ঘরের মধ্যে ঐ ঘর সবচেয়ে ভালো, যে ঘরে ইয়াতিম থাকে এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়। নিকৃষ্ট ঘর হচ্ছে সেইটি যে ঘরে ইয়াতিম থাকে কিন্তু তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।[৯] রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহ ছাড়া যে ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলানোর আর কেউ নেই, সেই ইয়াতিমের মাথায় যে হাত বুলায়, তার হাতের পরশ পাওয়া প্রতিটি চুলের বদলায় সে এক একটি পুণ্য লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন ইয়াতিমের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, সে আর আমি এভাবে অর্থাৎ পাশাপাশি জান্নাতে থাকবো।'[১০] রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতিমের ভরণপোষণকারী জান্নাতে এভাবে থাকবো।' এই বলে তিনি হাতের দুই আঙ্গুল একত্রিত করেন।[১১] এক ব্যক্তি আবু দারদাকে রা. বলল : আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন : ইয়াতিমের প্রতি দয়াশীল হও, তাকে কাছে টেনে নাও এবং নিজের খাদ্য থেকে তাকে খাওয়াও। কেননা একবার এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালো যে, তার হৃদয় খুবই কঠিন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যদি চাও তোমার হৃদয় কোমল হোক, তাহলে ইয়াতিমকে নিজের নিকটবর্তী কর, তার মাথায় হাত বুলাও এবং নিজের খাদ্য থেকে তাকে খাওয়াও। এসব করলে তোমার হৃদয় কোমল হয়ে যাবে এবং তোমার প্রয়োজন মিটে যাবে।[১২] নিজের সন্তানের সাথে যে ধরনের ব্যবহার করা হয়, ইয়াতিমের সাথে সেই ধরনের ব্যবহারই করতে হবে। তাদের জন্য যেমন সর্বদা কল্যাণ কামনা করা হয়, ইয়াতিমের জন্য একই ভাবে কল্যাণ কামনা করতে হবে। তাদের সাথে মমতা ও স্নেহমাখা কণ্ঠে কথা বলতে হবে। এমন কোন আচরণ করা যাবে না যাতে তার মনে কোন দুঃখ পায় এবং তার মন ভেঙ্গে যায়। আল্লাহতাআলা বলেন, 'লোকদের এ কথা মনে করে ভয় করা উচিত, যদি তারা অসহায় সন্তান

রেখে যেতো তাহলে মরার সময় তাদের জন্য কতই না আশংকা হতো। কাজেই তাদের আল্লাহকে ভয় করা এবং ন্যায়সংগত কথা বলা উচিত।'[১৩] বর্ণিত আছে যে, 'আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদকে আ. ওহীর মারফত বলেছিলেন : হে দাউদ! ইয়াতিমের জন্য দরদী পিতার মত হয়ে যাও। আর বিধবার জন্য স্নেহময় স্বামীর মত হয়ে যাও। আর জেনে রাখ যেমন বীজ তুমি বপন করবে তেমনই ফসল পাবে। অর্থাৎ তুমি অন্যের সাথে যেমন আচরণ করবে তোমার মৃত্যুর পর তোমার ইয়াতিম সন্তান ও বিধবা স্ত্রীর সাথেও তেমনি আচরণ করা হবে। দাউদ আ. মুনাজাতে বলেছিলেন : হে আমার রব! যে ব্যক্তি তোমার সন্তুষ্টির জন্য ইয়াতিম ও বিধবাকে সাহায্য করে, তার প্রতিদান কিরূপ? আল্লাহতাআলা জবাব দিলেন : কিয়ামতের দিন যখন আমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেই দিন তাকে আরশের ছায়ার নিচে রাখবো।'[১৪] আল্লাহতাআলা আরো বলেন, ইয়াতিমের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করো, যে কল্যাণ তোমরা করবে তা আল্লাহর অগোচরে থাকবে না।'[১৫] সহায় সম্পদহীন ইয়াতিমের দায়িত্ব নিবে দেশের সরকার। সরকার প্রথমত তার আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে তাদের লালন পালনের ব্যবস্থা করবে। তা যদি সম্ভব না হয় তবে রাজকোষ থেকেই তাদের ভরণপোষণসহ লালন পালনের ব্যবস্থা করবে।

ইয়াতিম ও ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন

ইসলামের মীরাসী আইনানুসারে পৌত্র ও পৌত্রী সরাসরি তাদের পিতামহের সম্পত্তির অংশীদার হতে পারে না। বরং তাদের পিতা-মাতার মাধ্যমে অংশীদার হতে পারে। কিন্তু পিতা-মাতা যদি দাদা বা নানার পূর্বেই মারা যায়, তবে মাঝখানের সূত্র ছিন্ন হওয়ার দরুণ মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে। অজ্ঞ বা ইসলাম বিদ্বেষী মহল এটিকে অমানবিক বলে অভিহিত করে। যার দরুন এরা যুগে যুগে এ আইনটির পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইউব খান কর্তৃক জারিকৃত 'মুসলিম পারিবারিক আইন' অধ্যাদেশ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন ৮ম অধ্যাদেশ জারি করে এক সংশোধনীর মাধ্যমে পৌত্র ও পৌত্রীকে তাদের পিতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্বত্ব প্রদান করে। এবং বাংলাদেশেও এ আইনটি তখন থেকেই বলবৎ আছে। এ আইনের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে, 'যার সম্পত্তি বণ্টন করা হবে, তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তার কোন পুত্র বা কন্যা স্বীয় সন্তান রেখে মারা যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনকালে মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ জীবত থাকলে তারা প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তির ঐ অংশ পাবে।' প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর আইনের গভীরে প্রবেশ করেনি এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝেনি। একজন ছেলে বা মেয়ে পিতার বর্তমানেই যদি মারা যায়, তবে পিতার সম্পদে সে তো অংশীদারই হলো না, তাহলে সংশ্লিষ্টরা সম্পদ পাবে কি করে। বরং না পাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ পৌত্র-পৌত্রী এবং দাদা-দাদীর মাঝের মূল সূত্র হলো পিতা। মাঝের সূত্র যদি মীরাস বণ্টনের আগেই ছেদ হয়ে যায় এবং এর পরও মীরাসের ব্যবস্থা রাখা হয়, তবে এ ধরনের মীরাসের যুক্তিসঙ্গত দাবি নিয়ে আরো অনেকেই এগিয়ে আসতে পারে। ফলে মীরাসের দীর্ঘসূত্রিতা

শুরু হবে। তখন যদি পৌত্র-পৌত্রীকে মীরাস দিতে হয়, তাহলে অন্যান্য সম্পর্কে আত্মীয়রা বঞ্চিত থাকবে কেন? প্রকৃতপক্ষে মীরাসী আইনে সম্পর্কের আত্মীয় উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভের মানদণ্ড নয়। প্রকৃত মানদণ্ড হলো নিকট আত্মীয়। এ সম্পর্কে আল্লাহতাআলা বলেন : 'তোমরা জানো না তোমাদের বাপ-মা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের বেশি নিকটবর্তী। এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্যি সকল সত্য জানেন এবং সকল কল্যাণময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন।'[১৬]

এ আয়াতের মাধ্যমে মীরাসে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করতে যারা সক্ষম নয়, এ ব্যাপারে যাদের জ্ঞান অজ্ঞতার পর্যায়ভুক্ত এবং যারা নিজেদের অপরিপক্ক বুদ্ধির সাহায্যে আল্লাহর এ আইনের ত্রুটি দূর করতে চায় তাদের জওয়াব দেয়া হয়েছে। যেহেতু মানুষ আল্লাহর তাআলারই সৃষ্টি। সুতরাং তাঁরই ভালো জানা উচিত কিসে মানুষের কল্যাণ এবং কিসে অকল্যাণ। তাই আল্লাহতাআলা যে অংশ যেভাবে নির্ধারণ করেছেন তা একেবারেই নির্ভুল। এতে মানুষের হাত দেয়ার অর্থ হলো আল্লাহর আইনের সুস্পষ্ট সীমা লংঘন করা। এ সমস্ত লোকদের আল্লাহর এক মারাত্মক ও অত্যন্ত ভীতি প্রদর্শনকারী আয়াতের সংবাদ দিচ্ছি। আল্লাহতাআলা বলেন : 'এগুলো হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ এমন বাগিচায় প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করবে এবং তার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে, আল্লাহ তাকে আগুনে ফেলে দেবেন। সেখানে সে থাকবে চিরকাল, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি।[১৭]

ইয়াতিম নাতি ও নাতনীর জন্য আল্লাহতাআলা যে সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছেন তা স্থূলজ্ঞানী বা জ্ঞানপাপীদের জ্ঞাতার্থে নিম্নে দেয়া হলো :

* মীরাস বণ্টনের সময় মানবিক দিক বিবেচনার জন্য আল্লাহতাআলার আলাদা নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহতাআলা বলেন : 'ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার সময় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম ও মিসকিনরা এলে তাদেরকেও ঐ সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলো।'[১৮] শরীয়তের বিধান মতে মীরাসে তাদের অংশ নেই ঠিকই কিন্তু একটু ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তাদেরকেও কিছু দাও। সংকীর্ণমনা লোকদের মতো তাদের সাথে নির্মম আচরণ, কটু কথাবার্তা বলো না। তাছাড়া এ ধরনের ঘটনা জীবিত লোকদের জন্য একটি পরীক্ষাও বটে। এর মাধ্যমে আল্লাহ দেখতে চান মানুষ মানুষের জন্য কতটুকু এগিয়ে আসে। মানুষের মানবিক গুণকে উজ্জীবিত করার জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

* নাতি-নাতনী ও সম্পর্কের আত্মীয়দের জন্য অসিয়তের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহতাআলা বলেন, 'তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন সম্পদ ত্যাগ করে যেতে থাকলে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী অসিয়ত করে যাওয়াকে তার জন্য ফরয করা হয়েছে, এটা মুত্তাকীদের কর্তব্য।'[১৯] আয়াতটিতে এটা ফরজ এবং

আল্লাহর পক্ষ থেকে মুত্তাকীদের কর্তব্য বলা হয়েছে। দাদা ও নানার জীবদ্দশায় যে সব নাতি-নাতনীর বাবা বা মা মারা যায় তাদের ওপর ফরয এবং আল্লাহর হক হলো এদের জন্য অসিয়ত করা। অনেকে মনে করেন মীরাস বণ্টনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ আয়াত মনসুখ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে এ আয়াতের বর্ণিত অসিয়তের মাধ্যমে মীরাস বণ্টন হতো। কিন্তু মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পর অসিয়তের মাধ্যমে মীরাস বণ্টন রহিত হয়েছে মাত্র অর্থাৎ আল্লাহ যাদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাদের ব্যাপারে অসিয়ত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যারা মীরাসী আইন অনুযায়ী মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের জন্য অসিয়ত রহিত হয়নি। বরং এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করা দাদা বা নানার কর্তব্য। আরো বিশেষভাবে উল্লেখ্য, অসিয়ত পূর্ণ করার পর মীরাস বণ্টনের জন্য আল্লাহতাআলা নির্দেশ করেছেন। আল্লাহতাআলা বলেন : '(এ সমস্ত অংশ বের করতে হবে অর্থাৎ মীরাস বণ্টিত হবে) অসিয়ত পূর্ণ করার এবং সে যে ঋণ রেখে গেছে তা পরিশোধ করার পর।'[২০]
* এর পরও যদি কোনরূপ ব্যবস্থা না হয়, তার দায়িত্ব নিবে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার। সরকারি কোষাগার থেকে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তা না করে আল্লাহর আইনে হাত দেয়া কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে আল্লাহদ্রোহী, আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ ও সীমালংঘন বলে বিবেচিত হবে।

ইয়াতিমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাত করার পরিণাম

ইয়াতিমের মাল আগুন তুল্য। কুরআন ও হাদীসে ইয়াতিমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাত করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ বলে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহতাআলা বলেন, 'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের ধন-সম্পদ খায়, তারা আগুন দিয়ে নিজেদের পেট পূর্ণ করে। অবশ্যই তাদের পরিণাম জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন।'[২১] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ওহোদ যুদ্ধের পর হযরত সাদ ইবনে রবিআ'র স্ত্রী তাঁর দুটি শিশু সন্তানকে নিয়ে নবী স. এর খেদমতে হাজির হন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এরা সাদের মেয়ে। এদের বাপ আপনার সাথে যুদ্ধে শরীক হয়ে ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এদের চাচা তার সমস্ত সম্পদ নিজের আয়ত্ত্বাধীন করে নিয়েছে। এদের জন্য একটি দানাও রাখেনি। এখন বলুন কে এ মেয়েদের বিয়ে করবে? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা ইয়াতিমের সম্পদের ধারে কাছেও যাবে না। অবশ্য তারা জ্ঞানবুদ্ধি লাভের বয়সে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা ভালো ও উত্তম পন্থায় ইয়াতিমের অভিভাবক তথা লালনপালনকারী প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারবে।'[২২] 'ইয়াতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও। ভালো সম্পদকে খারাপ সম্পদ দিয়ে বদল করো না। ইয়াতিমের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে গ্রাস করো না। তা মহা পাপ।'[২৩] আল্লাহতাআলা বলেন, 'ইয়াতিমরা বড় হয়ে তাদের সম্পদ বুঝে নিবে এ ভয়ে সীমালংঘন করে তাদের সম্পদ খেয়ে ফেলো না। স্বচ্ছল ব্যক্তি যেন তাদের সম্পদ থেকে বেঁচে থাকে। অভিভাবক গরীব হলে প্রচলিত

রীতিতে খাবে।[২৪] ইয়াতিমের সম্পদ থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের চেষ্টা করাও উচিত নয়। তবে ইয়াতিমের কল্যাণার্থে সৎ নিয়তে তাদের সম্পদ ব্যবহার করা যাবে। ইয়াতিমের বন্ধু ইয়াতিম নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে দূরে থাক। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল, ঐ গুলো কি? তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, যে জীবন ও প্রাণকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তা অন্যায়ভাবে হত্যা করা, তবে ন্যায়ত হত্যা করলে ভিন্ন কথা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের ধন-মাল আত্মসাত করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী সরল-প্রাণ মুমিন স্ত্রীলোকের প্রতি চারিত্রিক অপবাদ আরোপ করা।[২৫]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন : মিরাজের রাত্রে আমি কিছু লোককে দেখলাম, যাদের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে অপর কতক লোক। যারা তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত, তারা ঐ লোকদের মুখের চোয়াল খুলে হা করাচ্ছে, আর অপর কয়েকজন জাহান্নাম থেকে আস্ত আস্ত পাথরের টুকরো এনে তাদের গলায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সংগে সংগে পাথরগুলো তাদের মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন, যারা ইয়াতিমের সম্পত্তি আত্মসাত করে তারা। তারা কেবল আগুনই খেয়ে থাকে।[২৬] আত্মসাতের এমন কঠোর হুশিয়ারী থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমাজের অপরিণামদর্শী ব্যক্তিগণ ইয়াতিমের সম্পত্তি আত্মসাত করে থাকে। অবশ্য আল্লাহর এ সকল কঠিন হুশিয়ারীর সাথে সাথে এ মজলুম জনতার ন্যায়বিচারের ভার রাষ্ট্রের ওপরও বর্তায়। ইয়াতিমের সম্পদ রক্ষা আইন থাকা জরুরী।

সম্পদশালী ইয়াতিমের লালন-পালন

সম্পদশালী ইয়াতিমের লালন-পালনে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। আল্লাহতাআলা বলেন, 'ইয়াতিমরা বড় হয়ে তাদের সম্পদ বুঝে নিবে এ ভয়ে সীমালংঘন করে তাদের সম্পদ খেয়ে ফেলো না। সচ্ছল ব্যক্তি যেন তাদের সম্পদ থেকে আলাদা থাকে। অভিভাবক গরীব হলে প্রচলিত রীতিতে খাবে। ইয়াতিমদের পরীক্ষা করতে থাকো যতদিন না তারা বিয়ের বয়সে পৌছে। যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতার সন্ধান পাও তাহলে সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। যখন তাদের সম্পদ হস্তান্তর করবে তখন সাক্ষীদের উপস্থিতিতেই করবে। আর হিসেব নেয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[২৭] 'তোমরা ইয়াতিমের সম্পদের ধারে কাছেও যাবে না। অবশ্য তারা জ্ঞানবুদ্ধি লাভের বয়সে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা ভালো ও উত্তম পন্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করা যাবে।'[২৮] আল্লাহতাআলার নির্দেশ 'যে ধনী সে যেন সংযত থাকে। আর যে দরিদ্র, সে যেন ন্যায়সংগত পরিমাণে ভক্ষণ করে।' এ ব্যাপারে মুফাসসির, ফিকাহবিদ ও ওলামায়ে কেরাম বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী তার তাফসীরে চারটি মত ব্যক্ত করেছেন, প্রথম মত এই যে, এটা ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় মত এই যে, যতটুকু তার

জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন ততটকু ভক্ষণ করা যাবে এবং মোটেই অপচয় বা অপব্যয় করা চলবে না। তৃতীয় মত এই যে, অভিভাবক শুধু তখনই পারিশ্রমিক নিতে পারবে যখন সে ইয়াতিমের জন্য কোন কাজ করে এবং ঐ কাজের পরিমাণের সাথে সংগতি রেখেই নিতে পারবে। চতুর্থ মত এই যে, সে যখন তীব্র প্রয়োজন অনুভব করবে কেবল তখনই নিতে পারবে।'[২৯]
ইয়াতিমের জন্য কাজ করা হলে তা থেকে খাদ্য গ্রহণ করা যাবে। ইয়াতিমের মাল থেকে কর্জ নেয়া যাবে, তবে শর্ত হলো তা ফেরত দিতে হবে। হযরত উমর রা. কর্জ নিতেন এবং পরে তা শোধ করে দিতেন। আল হাসান, ইবরাহিম, আতা, আবু রিবাহ ও মকহুল থেকে বর্ণিত, হযরত উমর রা. বাইতুল মাল থেকে সেই পরিমাণ গ্রহণ করতেন, যার দ্বারা ক্ষুধা মিটে এবং লজ্জাস্থান আবৃত করা যায়। পরে সামর্থ্য হলে তিনি তা ফেরত দিতেন। ইয়াতিমের ব্যাপারটিও ঐ রকম। কেউ বলেছেন, তা মরা লাশের পর্যায়ে গণ্য। কঠিনভাবে ঠেকে গেলে তা থেকে গ্রহণ করা। সচ্ছলতা না থাকলে সে গ্রহণ হালালের মধ্যে গণ্য। আবু বকর আল জাসসাস ইবনে আব্বাস রা. থেকে চারটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর মূল কথা হলো : এক. কেউ যদি ইয়াতিমের পশু পালনে কাজ করে তাহলে সেই পশুর দুধ সে সেবন করবে। দ্বিতীয়. যা নেবে তা সে পরে ফিরিয়ে দেবে। তৃতীয়. ইয়াতিমের ধন-মাল থেকে সে কিছুই নিজের জন্য ব্যয় করবে না। তবে তার নিজের মাল থেকে সে খাবার খাবে, যতক্ষণ না ইয়াতিমের মাল থেকে খাওয়ার মুহতাজ হয়ে পড়ে। আর চতুর্থ. হচ্ছে আয়াতটি মনসুখ। হানাফী ফিকহবিদদের মতে, ইয়াতিমের মাল থেকে কর্জ বাবদ কিছুই গ্রহণ করা যাবে না, অন্যভাবেও নয়, সে ধনী হোক, কি গরীব। তা থেকে অন্য কেউ ঋণ নেবে না। তবে ইমাম তাহাবী উল্লেখ করেছেন, আবু হানিফার মাযহাব হলো, ঠেকায় পড়লে ঋণ নেয়া যাবে, তবে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। উমর রা. থেকেও এরূপ মতই বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ানে সওরী বলেছেন, অসী ইয়াতিমের মাল থেকে কোন জিনিসে উপকৃত হবে, তা আমার জন্যে আশ্চর্যের বিষয় নয়। অবশ্য যদি তাতে ইয়াতিমের কোন ক্ষতি না হয়। যেমন প্লেট- যাতে লেখা হয়।[৩০]
সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী বলেছেন, সম্পত্তি দেখাশুনার বিনিময়ে নিজের পারিশ্রমিক ঠিক ততটুকু পরিমাণ গ্রহণ করতে পারে যতটুকু গ্রহণ করাকে একজন নিরপেক্ষ ও সুবিবেচক ব্যক্তি সংগত বলে মনে করতে পারে। তাছাড়া নিজের পারিশ্রমিক হিসাবে সে যতটুকু গ্রহণ করবে, তা গোপনে গ্রহণ করবে না বরং প্রকাশ্যে গ্রহণ করবে এবং তার হিসেব রাখবে।[৩১]

সম্পদশালী ইয়াতিম মেয়ের বিবাহ

'যদি তোমরা ইয়াতিম মেয়েদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না বলে ভয় করো, তাহলে তোমাদের পছন্দের মেয়েদের থেকে বিয়ে করে নাও।'[৩২] ইমাম যুহরী উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা রা.কে বললাম: আল্লাহর কথা : 'যদি তোমরা ইয়াতিম মেয়েদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না বলে ভয় করো..... এর তাৎপর্য কি? তিনি জবাবে বললেন, হে বোন পুত্র! আয়াতে সেই ইয়াতিমের কথা বলা হয়েছে, যে তার অভিভাবকের

তত্ত্বাবধানে লালিত হয়। তখন সে তার ধন-মাল ও রূপ-সৌন্দর্য তার প্রতি আকৃষ্ট ও আগ্রহী হয়ে পড়ে এবং খুব সামান্য মহরানার বিনিময়ে তাকে বিয়ে করতে সচেষ্ট হয়। আল্লাহ্ এ আয়াতে অভিভাবককে নিষেধ করেছেন এভাবে ইয়াতিম মেয়ে বিয়ে করতে। তাকে যদি বিয়েই করতে হয়, তাহলে তা সুবিচার ও ন্যায়সঙ্গতভাবে করতে হবে। বরং তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে অন্যান্য মেয়েলোক বিয়ে করতে। হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, এ আয়াতের পর-এ মেয়েদের ব্যাপারে রসূল স.-এর নিকট লোকেরা ফতোয়া চেয়েছে। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় : (হে নবী!) 'লোকেরা মেয়েদের ব্যাপারে তোমার নিকট ফতোয়া চায়। তুমি বল হ্যাঁ, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতোয়া দেন আর একই সাথে সেই বিধানও স্মরণ করিয়ে দেন, যা প্রথম থেকে এই কিতাবে তোমাদের শুনানো হচ্ছে। অর্থাৎ এই ইয়াতিম মেয়েদের সম্পর্কিত বিধানসমূহ, যাদের হক তোমরা আদায় করছো না। এবং যাদেরকে বিয়ে দিতে তোমরা বিরত থাকছো (অথবা লোভের বশবর্তি হয়ে নিজেরাই যাদেরকে বিয়ে করতে চাও)..... সূরা বাকারা ১২৭। হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, 'কিতাবে তোমাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয়' বলে সেই প্রথমোক্ত আয়াতটি বোঝানো হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে : 'তোমরা ইয়াতিমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না বলে যদি ভয় পাও'... আর শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে : 'এবং তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী হও' বলে সেই আগ্রহের কথা বলা হয়েছে, যা তোমাদের কেউ তোমাদের ক্রোড়ে লালিত ইয়াতিম কন্যার প্রতি পোষণ করে থাক। কিন্তু সে কন্যার ধন-মাল ও রূপ-সৌন্দর্য সামান্য হলে তা তোমরা পোষণ করো না। ইয়াতিম মেয়ের ধন-মাল ও রূপ-সৌন্দর্যে আগ্রহীদেরকে তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের সম্পদও রূপ সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণে ন্যায় ও সুবিচার করতে পার না। যদি তা করতে পারো, তাহলে তাদের বিয়ে করায় দোষ নেই। আবু আলকর জাসসাস বলেছেন, হযরত আয়েশা রা. 'তোমরা ইয়াতিম কন্যাদের প্রতি সুবিচার ও ন্যায়বিচার করতে পারবে না বলে যদি ভয় পাও' আয়াতংশের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে।[৩৩] এ হাদীসগুলো বুখারী ও মুসলিম থেকে নেয়া হয়েছে। আর জাহিলি সমাজ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা নতুন সমাজের লোকেরা আল্লাহতাআলার পথে দৃঢ়তার সাথে ঠিক থাকতে গিয়ে মাঝে মাঝে যে সব সংকটবোধ করছিল তার নিরসনের জন্য রসূল স.-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতো এবং সঠিক পথ খুঁজে নিতে গিয়ে যে আগ্রহ প্রদর্শন করতো তারই একটি জীবন্ত ছবি এ আলোচনায় ফুটে উঠেছে।

ইয়াতিম বালিকাদের উপরোক্ত চিত্রটি জাহেলিয়াতের একটি খণ্ডচিত্র। সে যুগে ইয়াতিম বালিকারা সমাজের ক্ষমতাধর লোকদের নিকট আশ্রয় নিতে বাধ্য হতো। অতপর সেই আশ্রয়দাতারা তাদের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে কোন সময় তাদের ওপর চাদর নিক্ষেপ করতো, ফলে চিরদিনের জন্য তারা অপর লোকদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যেত এবং কেউ তাদের বিয়ে করতে পারতো না। আর সুন্দরী হলে তো কথাই ছিল না। তাদেরকে বিয়ে করে তাদের ধন সম্পদ কুক্ষিগত করতো। আর চেহারা-সুরত আকর্ষণীয় না হলে মৃত্যু পর্যন্ত তারা কোন পুরুষের সংগ পেত না। আর মারা গেলে তাদের

আশ্রয়দাতারা উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হতো। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহতাআলা এই রীতি বাতিল ঘোষণা করেন।

ইয়াতিমের সম্পদ হস্তান্তর প্রক্রিয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর ইয়াতিমদের যাচাই করতে থাকো, যতদিন না তারা বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছে যায়। তারপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতার সন্ধান পাও, তাহলে তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করে দাও।'[৩৪] ইয়াতিম যখন সাবালক হয়ে যেতে থাকে তখন তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কি পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে তা দেখতে হবে এবং তারা নিজেদের বিষয়াদী আপন দায়িত্বে পরিচালনা করার যোগ্যতা কতটুকু অর্জন করেছে সে দিকেও তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। অর্থাৎ ধন-সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য দুটি শর্তকে অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। একটি হচ্ছে, সাবালকত্ব আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অর্থ-সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন। প্রথম শর্তটির ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। দ্বিতীয় শর্তটির ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার র. মত হচ্ছে এই যে, সাবালক হবার পরও যদি ইয়াতিমের মধ্যে 'যোগ্যতা' না পাওয়া যায়, তাহলে তার অভিভাবককে সর্বাধিক আরো সাত বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর যোগ্যতা পাওয়া যাক বা না যাক সর্বাবস্থায় ইয়াতিমকে তার ধন-সম্পদের দায়িত্ব দিয়ে দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেঈ র. মতে ধন-সম্পদ ইয়াতিমের হাতে সোপর্দ করার জন্য অবশ্যই 'যোগ্যতা' একটি অপরিহার্য শর্ত। সম্ভবত এঁদের মতে এ ব্যাপারে শরীয়তের বিষয়সমূহের ফয়সালাকারী কাযীর শরণাপন্ন হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যদি কাযীর সামনে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সংশ্লিষ্ট ইয়াতিমের মধ্যে যোগ্যতা পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তার বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য তিনি কাউকে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দেবেন।

আল্লাহ্ বলেছেন, 'ইয়াতিমকে পরীক্ষা কর'। কেউ বলেন, এ আদেশটির প্রেক্ষিতে ইয়াতিমকে ব্যবসায় নিয়োগ করে পরীক্ষা করা যাবে না। কারণ এতে যদি সে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তবে তার দায়-দায়িত্ব অভিভাবককে নিতে হবে। আবু বকর বলেন, ইয়াতিমের বিবেক-বুদ্ধি, ধর্ম পালন, সব ব্যাপারে বিচক্ষণতা ও সতর্কতাকে অন্তর্ভুক্ত করে এই পরীক্ষা করা হবে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারাদি নিয়ন্ত্রণ আয়ত্তকরণ ও তার ধন-সম্পদ সংরক্ষণে তার যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও সতর্কতা বিবেচনায় নিতে হবে। শুধুমাত্র কথার দ্বারা তার বিবেক-বুদ্ধির পরীক্ষা করা যাবে না। বরং বাস্তবক্ষেত্রে, সমাজ-সংসারের কাজে হস্তক্ষেপের অনুমতি না দেয়া হলে তার পরীক্ষার বিষয়টি অজানা থেকে যাবে। ব্যবসায়ের-সংসারের কাজের-অনুমতি দেয়া আর ধন-মাল তার হাতে দিয়ে দেয়া এক কথা নয়। কেননা অনুমতিটা হলো- ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন করার আদেশ দেয়া।

সুতরাং এ পরীক্ষার জন্যেই ব্যবসায়ে সাংসারিক কাজে তাকে অনুমতিদান অপরিহার্য। এর মাধ্যমে তার প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাবে, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণ ও বিচক্ষণতার পরিপক্কতা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহর কথা : 'শেষ পর্যন্ত যখন তারা বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।' ইবনে আব্বাস রা.ও মুজাহিদ বলছেন, এ আয়াতে পূর্ণবয়স্কের কথা অর্থাৎ বিয়ে করার বয়স পর্যন্ত পৌঁছার কথা বলা হয়েছে। শব্দটি থেকে ইহতেলাম শব্দ গঠিত, যার অর্থ স্বপ্নে বির্যস্খলন। আল্লাহর কথা : 'যদি তোমরা তার বুদ্ধিমত্তা বিবেচনার লক্ষণ দেখ.... ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, তাদের মধ্যে বুদ্ধি-ব্যবস্থার যোগ্যতার স্খলন ঘটেছে। এও বলা হয়েছে যে, 'আল আয়নাসু' শব্দের অর্থ অনুভব করতে পারা, বুঝতে পারা। তিনি আরো বলেছেন, জ্ঞান-বুদ্ধির সুস্থতা-পরিপক্কাতা। ধন-মাল সংরক্ষণের যোগ্যতা। আল্লাহর কথা : 'তখন তাদের ধন-সম্পদ তাদের নিকট প্রত্যার্পণ কর।' এ কথার দাবি হচ্ছে, পূর্ণবয়স্ক ও তাদের বুদ্ধি-বিবেচনার স্ফূরণ হওয়ার পর তাদের ধন-মাল তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব।[৩৫]

আল্লাহর দৃষ্টিতে ইয়াতিমের অধিকারের গুরুত্ব যে কত বেশি তা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। সূরায়ে নিসার প্রথম দুটি রুকু ছাড়াও প্রায় সারা কুরআনে তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছে। দুর্বল অক্ষম শিশু ইয়াতিম বালক বালিকাদের হেফাজত, মীরাসে তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং জাহিলিয়াত ও তার অপমানকর অত্যাচারী রীতি-নীতি বর্বরতা থেকে উদ্ধার করার জন্য অসংখ্য বিধি-বিধান ও নির্দেশিকা আমরা ইসলামী আইনে দেখতে পাই। আল্লাহর রসূল স. ইসলামী সমাজ পরিচালনার এ সমস্ত স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে সংহতি ও সহঅবস্থানের বাস্তব ও ব্যবহারিক বিধি-বিধান তৈরি করেছিলেন। ফলে ইয়াতিম তার পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি পেত। কিন্তু ইসলামের বিধি-বিধান ভুলে গিয়ে আমরা আবার নব্য জাহিলিয়াতের অন্ধকারে প্রবেশ করেছি। এ থেকে উত্তরণের একটি মাত্র উপায় হলো আল্লাহর উল্লেখিত বিধানাবলীর আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ইয়াতিম সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআন, সূরা দোহা, আয়াত ৬-১০।
২. তাফসীরে মারেফুল কুরআন-মুফতি মুহাম্মদ শা'ফী র.।
৩. আল ক্বামুসুল ওয়াজীয ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, রিয়াদ প্রকাশনী-১৯৯৮।
৪. মিশকাত পৃষ্ঠা ২৮৪।
৫. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৩৬।
৬. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২১৫।
৭. আল কুরআন, সূরা আদ দোহা, আয়াত ৯।
৮. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২২০।
৯. সুনানে ইবনু মাজা।

১০. মুসনাদে আহমাদ।
১১. সহীহ বুখারী।
১২. কবীরা গুনাহ, পৃষ্ঠা ৫২, ইমাম আযযাহাবী, প্রথম প্রকাশ জুলাই-১৯৯৬, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
১৩. আল কুরআন, সূরা নিসা আয়াত ৯।
১৪. কবীরা গুনাহ, পৃষ্ঠা ৫৩, ইমাম আযযাহাবী, প্রথম প্রকাশ জুলাই-১৯৯৬, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
১৫. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ১২৭।
১৬. আল কুরআন, সূরা নিসা আয়াত ১১।
১৭. আল কুরআন, সূরা নিসা আয়াত ১৩-১৪।
১৮. আল কুরআন, সূরা নিসা আয়াত ৮।
১৯. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ১৮০।
২০. আল কুরআন, সূরা নিসা আয়াত ১১।
২১. আল কুরআন, সূরা নিসা আয়াত ১০।
২২. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১৫২।
২৩. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ২।
২৪. আল কুরআন, সূরা নিসা আয়াত ৬।
২৫. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।
২৬. সহীহ মুসলিম।
২৭. আল কুরআন, সূরা নিসা আয়াত ৬।
২৮. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১৫২।
২৯. কবীরা গুনাহ, পৃষ্ঠা ৫৩, ইমাম আযযাহাবী, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৬, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
৩০. আহকামুল কুরআন : আবু বকর আহমাদ আল জাসসাস র. অনুবাদ মাওলানা আঃ রহিম খায়রুন প্রকাশনী-১৯৯১, পৃষ্ঠা ১৫৬।
৩১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসার টিকা ১১।
৩২. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত ৩।
৩৩. আহকামুল কুরআন : আবু বকর আহমাদ আল জাসসাস র. অনুবাদ মাওলানা আঃ রহিম খায়রুন প্রকাশনী-১৯৯১, পৃষ্ঠা ১২৩।
৩৪. আল কুরআন, সূরা নিসা আয়াত ৬।
৩৫. আহকামুল কুরআন : আবু বকর আহমাদ আল জাসসাস র. অনুবাদ মাওলানা আঃ রহিম খায়রুন প্রকাশনী-১৯৯১, পৃষ্ঠা ১৫৩।

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা : ৮৮-১০০

আকযিয়াতুর রসূল স.

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ আল-আন্দালুসী

॥ পাঁচ ॥

কিতাবের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। আল্লাহতাআলার প্রশংসা তিনি নিজে যেভাবে করেছেন সেভাবেই করা উচিত। বস্তুত আল্লাহর মখলুক আল্লাহর যতো প্রশংসাই করুক না কেন আল্লাহতাআলা এর চেয়ে অনেক বেশি প্রশংসার যোগ্য। মখলুকের কৃত প্রশংসা এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর গুণাবলী কখনো নিঃশেষ হবে না, লয় ও ক্ষয় হবে না। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

হামদ ও ছানার পর ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ বলেন, ইনশাআল্লাহ আমি এ কিতাবে সেইসব মোকদ্দমার আলোচনা করবো রসূলুল্লাহ স. নিজে যেগুলোর মীমাংসা করেছেন কিংবা রসূলুল্লাহ স. নিজে সাহাবীদেরকে যেসব ফয়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন; তন্মধ্যে যেসব ফয়সালার বর্ণনা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।[১] কাউকে যদি বিচার করার দায়িত্ব দেয়া হয় তার কর্তব্য হয়ে পড়ে আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে ফয়সালা করা। নয়তো এই তিনটির ভিত্তিতে চিন্তা গবেষণা করে উপযোগী ফয়সালা উদ্ভাবন করা।

ইমাম মালিক,[২] ইমাম শাফেয়ী[৩] ও ইমাম আবু হানিফা র.[৪] এ ব্যাপারে একমত যে, কোন শাসক যদি মানোত্তীর্ণ জ্ঞানী আলেম[৫] তাকওয়া,[৬] সদাচার এবং হাদীস ও ফিকাহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ না হয় তবে সে গণমানুষের দায়েরকৃত মামলা মোকদ্দমার ফয়সালা করতে সক্ষম হবে না।

ইমাম মালিক র. বলেন, একজন বিচারকের মধ্যে যেসব গুণাবলী থাকা আবশ্যক আমার দৃষ্টিতে এ যুগের খুব কম মানুষের মধ্যেই এসব গুণাবলী পাওয়া যায়। তিনি বলেন, অন্তত দু'টি গুণ যদি কারো মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে তাকে বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত করা যায়। তা হলো–

১. জ্ঞান বা প্রজ্ঞা

২. যুহুদ (অল্পে তুষ্টি) ও তাকওয়া (সংযম)

আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব[৭] বলেন, বিচারকের মধ্যে যদি সাতটি বৈশিষ্ট নাও পাওয়া যায় তবে জ্ঞান ও তাকওয়ার বৈশিষ্ট অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ জ্ঞান দ্বারা তিনি উদ্ভূত সমস্যার সঠিক

সমাধানের প্রয়াসী হতে পারবেন। জ্ঞানের সাথেই সকল সৎ ও ভালো গুণাবলী সম্পৃক্ত। আর তাকওয়া দ্বারা মানুষ অন্যায় অপরাধ ও যাবতীয় মন্দ ও কদর্যতা থেকে পুত:পবিত্র থাকে। তাই কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি ইলম বা প্রজ্ঞার অন্বেষণ করেন তাহলে তিনি সঠিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তির বোধজ্ঞান যদি দুর্বল হয় তবে সে শত চেষ্টা করেও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে না।

গ্রন্থকার ইবনে তুল্লা বলেন, রসূল স. কিসাস ও দিয়াত সম্পর্কে যেসব ফয়সালা দিয়েছেন তার বর্ণনা দিয়ে এ কিতাবের সূচনা করছি।

কেননা ইমাম মুসলিম[৮] র. এর বর্ণনামতে রসূল স. এক হাদীসে বলেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহতাআলা সর্বপ্রথম নরহত্যার বিচার করবেন এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তির নামাযের হিসাব নেবেন। যার আমলনামায় নামায থাকবে তার অপরাপর আমলেরও হিসাব নিবেন কিন্তু যার আমলনামায় নামায থাকবে না তার আর কোন আমলের হিসাব নেয়ার প্রয়োজনই বোধ করবেন না। শিরকের পরে নরহত্যার চেয়ে আল্লাহর কাছে আর কোন গুরুতর গোনাহ নেই।'

রসূল স. বলেন, 'পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু রয়েছে এর সব কিছুর ধ্বংস হয়ে যাওয়াও আল্লাহর কাছে একজন মুমিন মুসলমানের নিহত হওয়ার বিপরীতে নগণ্য।' এ হাদীসটি ইবনুল আহমার[৯] তাঁর প্রণীত মুসনাদে রেওয়ায়াত করেছেন।

কিসাস ও দিয়াতের সাধারণ বিধান

রসূল আলাইহিস সালাম[১০] বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করতে সামান্য পরিমাণও সহযোগিতা করল, কেয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে যে, তার দুই চোখের মাঝে লেখা থাকবে, 'এ ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।'

সহীহ বুখারীতে[১১] বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি অব্যাহতভাবে তার ধর্মের পরিসরের মধ্যে অবস্থান করে, যাবত না সে অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটায়' (বুখারী, দিয়াত, বাব ১, নং ৬৮৬২)।

আলউসাইলী[১২] র. এর বর্ণনায় 'মিন দীনিহী ' শব্দ রয়েছে আর আলকাবেসীর[১৩] রেওয়ায়েতে মিন যান্নাবিহী বলা হয়েছে। আল খাত্তাবীর[১৪] কিতাবে বলা হয়েছে, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা[১৫] বলেন, আধা শব্দ দিয়েও হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতার অর্থ হলো, কেউ যদি কাউকে হত্যাকাণ্ডে উৎসাহিত করতে শুধু এতটুকু বলে, 'অমুককে মেরে ফেলো'। রসূল স. যেমন বলেছিলেন, 'কাফা বিস সাইফে শাইয়ান'[১৬] এক্ষেত্রে রসূল স. এর উদ্দেশ্যে ছিল, সাক্ষির ক্ষেত্রে এখানে তরবারিই যথেষ্ট। খাত্তাবীর কিতাব ছাড়া অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, রসূল স. বলেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সম্মুখে হাজির হবে যে, সে না কোন দিন শিরক করেছে না অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করেছে, এমতাবস্থায় সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা রাখতে পারে।[১৭] খাত্তাবীর কিতাব ছাড়া অন্যান্য কিতাবে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে

এমন অবস্থায় হাজির হলো যে, সে না কখনো শিরক করেছে, না কখনো কোন মুসলিমের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করেছে (অর্থাৎ কোন মুসলিম খুন করেনি) এমতাবস্থায় আল্লাহতাআলা তাকে ক্ষমা করে দেয়া জরুরি মনে করেন।'

খাত্তাবী আরো বলেন, রসূল স. বলেন, 'মুমিন যতোক্ষণ পর্যন্ত কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে ততোক্ষণ পর্যন্ত ভারমুক্ত চনমনে এবং নেকীর কাজে লিপ্ত থাকে। কিন্তু যখন কোন অন্যায় হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে তখন সে ক্লান্ত[১৮] হয়ে যায়। খাত্তাবী বলেন, হাদীসে যে বাল্লাআ শব্দ বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো, ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাওয়া।

এই শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে তুল্লা বলেন, আরবী পরিভাষায় বলা হয় 'বাল্লাআল ফারাসু ওয়া ইনকাতাআ জারয়ুহু' ঘোড়াটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং তার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। 'বাল্লাআ'ল গারীমু' বাক্যের অর্থ হলো, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিটি সর্বশান্ত হয়ে পড়ল।

মুসনাদে বাক্কী[১৯] এবং মুসনাদে বায্যার[২০] এ বর্ণিত হয়েছে, রসূল স: বলেন, 'আসমান ও যমীনের সকল মাখলুক মিলেও যদি কোন মুসলমানকে খুন করে তবে আল্লাহতাআলা সকলকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।'

ইমাম মালিক র. বলেন, বর্ণিত আছে, রসূল স. বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেনি এমন অবস্থায় আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, তবে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে যে, তার পেটে গোনাহর কোন বোঝা থাকবে না।'

আলহারবীর[২১] ভাষ্য গ্রন্থে হযরত আবু যর র. থেকে বর্ণিত, রসূল স. এক রাতে নামাযে একই আয়াত বারবার পড়ছিলেন। অতপর নামাযান্তে তিনি সাহাবীদের উদ্দেশে বলেন, 'দাআউতু লি উম্মাতি' আমি আমার উম্মতের জন্যে দুআ করেছি। আবু যর র. বলেন, আমি লোকজনকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দেবো না কি? রসূল স. বললেন, কেন নয়? অতপর আমি তাড়াতাড়ি মজলিস থেকে উঠে গেলাম।

তথ্যপঞ্জি

১. মূল কিতাবে 'আখবারা লানা এর 'লানা শব্দ প্রকৃতপক্ষে 'আখবারানা' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে কোন উস্তাদ যখন তাঁর স্মৃতি কিংবা সংকলন থেকে শিষ্যদের হাদীস শোনাতেন তখন হাদীসের শুরুতে 'আখবারানা' শব্দ ব্যবহার করতেন। এটাই ছিল সেই যুগের উত্তম রীতি এবং উস্তাদের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার কল্যাণকর মাধ্যম মনে করা হতো এই রীতিকে।

কাযী ইয়ায র. বলেন, যদি শিষ্য সরাসরি কোন উস্তাদের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করে সেক্ষেত্রে 'আখরানা, হাদ্দাছানা, আনবা'না, সামিয়'তু, ক্বালালানা, যাকারানা, হাদীস বর্ণনায় উল্লেখিত শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কোন মতভিন্নতা নেই। সবার দৃষ্টিতেই এসব শব্দ প্রয়োগ জায়েয। ইবনুস্ সালাহ তাঁর রচিত 'উলুমুল হাদীস' গ্রন্থের ১২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, এটি এমন সময়ের কথা যখন 'আখবারানা' শব্দ উস্তাদের সামনে শাগরেদের ব্যবহারের রীতি ছিল না। (অর্থাৎ

বর্তমানে আখবারানা শব্দ সাগরেদ যখন উস্তাদের সামনে হাদীস পাঠ করে শুধু তখনই বলা হয়।)
ইবনুস সালাহ এর কথা থেকে উত্তরসূরীরা তথা পরবর্তীকালের আলেমদের দৃষ্টিতে 'আখবারানা' শব্দ উস্তাদের সামনে সাগরেদ যখন হাদীস পাঠ করে কেবল তখনই শুধু উচ্চারিত হয়ে থাকে। মুহাদ্দিসগণ এই রীতিকে বলেন, 'আরয'। এই রীতির আলোকে ইমাম ইবনে তুল্লার যেসব শাগরেদ তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারা বর্ণনা শেষে কি্রাআতান আলাইহি শব্দ সংযোজন করেছেন। মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শাগরেদ উস্তাদকে যে রেওয়ায়েত পাঠ করে শোনান সাধারণত এই রেওয়ায়েতকে সহীহ মনে করা হয়। অবশ্য অনেক আলেম এ মতের বিপক্ষে। কিন্তু তাদের দাবির যৌক্তিকতা নেই। ইমাম নববী তাঁর প্রণীত কিতাব তাদরীবুর রাভীতে (পৃ. ২৪০) এ কথাই উল্লেখ করেছেন।
ইমাম বগবী র. বলেন, শাগরেদ উস্তাদকে যে রেওয়ায়েত শোনায় এবং পরবর্তীতে সেই রেওয়ায়েত উস্তাদের সূত্রে বর্ণনা করে, হাদীসের ইমাম ও হাদীস বিশারদ আলেমগণের দৃষ্টিতে এটি একটি গ্রহণযোগ্য রীতি। (শরহে সুন্নাহ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৮)।
২. ইমাম মালিক : নাম আবু আবদুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক ইবনে আবু আমর ইবনে আল হারেস আল আসবাহী আলমাদানী। তিনি একাধারে ইমাম, হাফেযে হাদীস, ফকীহ ও শায়খুল ইসলাম ছিলেন। জগৎ বিখ্যাত চার ইমামের একজন তিনি। ৯৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরী সনে ৮৪ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। ইমাম মালিক র. এর ব্যক্তিত্ব এমনই সুবিখ্যাত যে পরিচয় দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রাখে না।
৩. ইমাম শাফেয়ী র. : নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস ইবনে আব্বাস ইবনে উছমান ইবনে শাফে ইবনে সায়েব ইবনে উবায়েদ ইবনে আবেদ ইয়াযীদ ইবনে হাশিম ইবনে আবদুল মুত্তালিব, ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফ আলকুরাশী, আলমুত্তালিবী আল মক্কী। ইমাম শাফেয়ী রসূল স. এর বংশের অধঃস্তন পুরুষ। তিনি ছিলেন রসূলের স. সুন্নতের খাদেম ও মুহাফিয। তিনি ১৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাক্রমে সেই বছর ইমাম আবু হানিফা র. ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ যেন ইমাম আবু হানিফা র. এর শূন্যতা ইমাম শাফেয়ীকে দিয়ে পূরণ করেন। তিনি হাফেযে হাদীসের অন্যতম ছিলেন। হাদীস, ফিকাহ ও উসূলে ফিকাহ সম্পর্কে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আরবী সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমকালীনদের জন্যে প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব। মুসলিম মিল্লাতে যাঁরা ইমাম হিসেবে ব্যাপকভাবে অনুসরণীয় হয়ে থাকেন তিনি তাদের অন্যতম। ২০৪ হিজরী সনে মিসরে ইমাম শাফেয়ী র. ইন্তিকাল করেন।
৪. ইমাম আবু হানিফা র. : ইমাম আযম হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর নাম নুমান ইবনে সাবিত.... আততামীমী আল কুফী। বিখ্যাত চারজন ইমামের মধ্যে তিনি অন্যতম। মুসলমানদের মধ্যে তাঁর অনুসারীই বেশি। তিনি ৮০ হিজরী সনে খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১৫০ হিজরী সনে খলীফা মনসুরের বন্দীশালায় ইন্তিকাল করেন।

৫. আলেম : একজন কাযী বা বিচারককে অবশ্যই কুরআনে কারীমের আয়াতের কোনটি নাসেখ ও মনসুখ (রহিতকারী ও রহিতকৃত) সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে। যাতে তিনি যে আয়াতের বিধান রহিত হয়ে গেছে তার আলোকে ফয়সালা না করে বসেন। কুরআন কারীমের আহকামাত সম্বলিত অধিকাংশ আয়াত সম্পর্কে তাকে জ্ঞাত হতে হবে। যেসব ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ঐকমত্য ছিল এবং যেসব বিষয়ে সাহাবাদের মধ্যে মতভিন্নতা ছিল এসব বিষয়ে তার জ্ঞান থাকতে হবে। তাবেয়ীনের মধ্যে যারা ফকীহ ছিলেন তাদের মতামত ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের মনীষীদের জীবনাচার, নীতি, আদর্শ ও অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। দুর্বল ও সবল এবং বিতর্কিত ও বিশুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনে সক্ষম হতে হবে। বিচারককে অবশ্যই উদ্ভূত সমস্যার সমাধান প্রথমে কুরআন কারীমে অতপর হাদীসে অনুসন্ধান করতে হবে, তাতে না পাওয়া গেলে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের কথা ও কর্মে সমাধান তালাশ করার যোগ্যতা থাকতে হবে। কোন ব্যাপারে যদি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তবে তাদের যে অভিমত কুরআনের নির্দেশের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ তার আলোকে ফয়সালা করতে হবে।

৬. হযরত আলী র. বলেন, যে লোকের মধ্যে অন্তত পাঁচটি বৈশিষ্ট না পাওয়া যাবে তাকে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করা যাবে না।

(১) পূত পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

(২) অত্যন্ত সহিষ্ণু ধীর স্থির স্বভাবের অধিকারী হতে হবে।

(৩) কুরআন সুন্নাহ ও প্রথম যুগের মুসলিম মনীষীদের মতামত সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে।

(৪) জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে বিচার সম্পর্কীয় বিষয়ে পরামর্শ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

(৫) আল্লাহর নির্দেশ পালনে জাগতিক কারো ভর্ৎসনা, নিন্দা, সাজা, শাস্তির ও শংকার ব্যাপারে বিচারককে অবশ্যই নির্ভীক হতে হবে।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. বলেন, বিচারকের মধ্যে অন্তত সাতটি গুণাবলী থাকতে হবে। এর একটিরও যদি ঘাটতি থাকে তবে সেটি বিচারকের উপযুক্ততার ক্ষেত্রে ত্রুটি বলে বিবেচিত হবে। ১. বুদ্ধি, ২. দীনের জ্ঞান, ৩. তাকওয়া, ৪. বাহ্যিক ও আত্মীক পবিত্রতা, ৫. স্পষ্টভাষায় কথা বলার দক্ষতা, ৬. সুন্নাহ সম্পর্কে ধারণা, ৭. ফিকহের জ্ঞান।

৭. আবদুল মালিক : আবদুল মালিক ইবনে হাবীব ইবনে সুলায়মান ইবনে হারুন ইবনে জানাহাসা ইবনে আব্বাস, ইবনে মারদাস আসসালমী। উপনাম আবু মারওয়ান। তিনি আন্দালুসের বিখ্যাত ফকীহ, মুহাদ্দিস, ভাষাবিদ, কবি, সূত্রজ্ঞানী এবং খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ ছিলেন। ১৭০ হিজরী সনের দু একবছর পর জন্মগ্রহণ করেন। ২৩৮/২৩৯ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। কাযী ইয়াজ তারতিবুল মাদারিকের ৩য় খণ্ডের ৩০ ও ৪৮ পৃষ্ঠায়, ইবনে ফারহুন আদদিবাজুল মুহাযযাব-এর ১৫৪ ও ১৫৬ পৃষ্ঠায়, আবু বকর শিবলী আলফিহরাসের

২০২ ও ২৬৫ পৃষ্ঠায় এবং হাফেয যাহবী তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাযের ১ম খণ্ডের ৫৩৭ পৃষ্ঠায় এই মহান মনীষীর পরিচিতি উল্লেখ করেছেন।

৮. ইমাম মুসলিম র. : নাম আবুল হাসান মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, ইবনে মুসলিম কুশায়রী নিশাপুরী। তিনি সহীহ মুসলিম সংকলন করেছেন। ২০৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। আজীবন ইমাম বুখারীর সংস্পর্শে কাটিয়েছেন এবং ইমাম বুখারীর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। ২৬১ হিজরী সনের ২৪ রজব রবিবার বিকেল বেলায় ইন্তিকাল করেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসটি তিনি মুসলিম শরীফের কিতাবুল কাসামার, বাবু মা জায়াতু বিদ্‌দিমাই ফিল আখিরাহ'তে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সূত্রে মারফু হাদীস হিসেবে সংকলন করেছেন। এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে কিতাবুর রিকাকের 'আলকামাসু ইয়াউমাল কিয়ামাতি বাবে সংকলিত হয়েছে। ফাতহুল বারীতে এ হাদীসটি ৬৮৬৪ নম্বরে সংকলিত হয়েছে। দৃশ্যত এ হাদীসটি আবু হুরায়রা র. বর্ণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। আবু হুরায়রা র. সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'কেয়ামতের দিন সর্বাগ্রে নামাযের হিসাব নেয়া হবে। সুনান ও মাসানিদ সংকলনকারীগণ এ হাদীসটি সংকলন করেছেন। ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে এ হাদীসের বৈপরীত্যের ব্যাখ্যায় বলেন, প্রথমোক্ত অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীসটি মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত আর আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীসটি খালিক তথা আল্লাহতাআলার সাথে সম্পৃক্ত। ইমাম নাসাঈ তাঁর সংকলিত সুনানে উভয় বর্ণনাকে একত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার নাসাঈর যে বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, এটি সুনানে নাসাঈর বাবু 'তাহরিমুদ দাম' এ সংকলিত হয়েছে।

৯. ইবনুল আহমার : নাম মুহাম্মদ ইবনে মুআবিয়া ইবনে আবদুর রহমান, ইবনে মুআবিয়া ইবনে ইসহাক, ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে মুআবিয়া ইবনে হিশাম ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান আবুবকর। তিনি ইবনুল আহমার নামে খ্যাত ছিলেন। আল হুমাইদী 'জাযওয়াতুল মুকতাবিস' এর ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ইবনুল আহমার মুসনাদ রচনা করেন। তিনি আরো লিখেন, ইবনুল আহমারই প্রথম ব্যক্তি যিনি রসূল স. এর উপর সুনান লিখেছেন এবং সেটি স্পেনে পৌঁছালে স্পেনের মুসলমানরা তা থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়। ৩৬৫ হিজরী সনে ইবনুল আহমার ইন্তিকাল করেন।

১০. ইমাম ইবনে তুল্লা রসূল স. এর নামের পর শুধু 'আলাইহিস সালাম' লিখেছেন। আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম' লিখেননি। এ ব্যাপারে 'আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মত পার্থক্যের মূল বিষয় হলো, রসূল স. এর নামোল্লেখের পর 'আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম' এর পরিবর্তে শুধু 'আলাইহিস সালাত' বা শুধু 'আলাইহিস সালাম' লেখা কি জায়েয? ইমাম নববী শুধু একটির উল্লেখ মাকরূহ বলেছেন। তিনি দলিল হিসেবে বলেন, আল্লাহতাআলা কুরআনুল করীমে 'সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু' তাসলিমা' বলেছেন। অর্থাৎ তোমরা নবী স. এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করো।' সূরা আহযাব আয়াত ৫৬। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর অনুসারীদের অনেকেই ইমাম নববীর মত অনুসরণ করেন।

আলেমদের অপর পক্ষের মত হলো, সালাত ও সালাম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আদায়ের মধ্যে কোন ধরনের দোষ নেই। কেননা, এখানে নির্দেশটি একই সাথে আদায় করা বুঝায় না। সালাত ও

সালাম ভিন্ন ভিন্নভাবেও আদায় করা যায়। কেউ যদি সালাতের মর্মার্থ সকাল বেলাকে বুঝে এবং সালামের দ্বারা বিকেলে রসূলের উপর দরুদ পাঠ করা বুঝে তাহলে সেতো উভয়টিই পালন করলো। কেননা আল কুরআনের সূরা আহযাবের ৪১ ও ৪২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে লোকসকল, যারা ঈমান এনেছো তারা আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তোমরা তসবিহ্ পাঠ করো।'

অনুরূপ বহু আয়াত এমন আছে, যেগুলোতে একাধিক নির্দেশ একত্রে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্নভাবে পালন করা হয়। বস্তুত পূর্বসূরী আলেমগণ সালাত ও সালাম একত্রেই আদায় করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই এই রীতিকে পরিহার করা পসন্দনীয় হতে পারে না।

ইবনে হাজার আলহাইছামী বলেন, অপসন্দনীয় বলতে এক্ষেত্রে অনুত্তম বোঝায়। এটিই সঠিক মত। ইমাম শাফেয়ীও তাঁর রচিত 'আররিসালাহ' গ্রন্থের কয়েক জায়গায় শুধু সালাত শব্দ লিখেছেন।

ইমাম বুখারী 'তারিখুল কবীর' গ্রন্থে এবং খতীব বাগদাদী, 'তাকঈদুল ইলম' গ্রন্থে সালাত ও সালাম ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত জানতে হলে দেখতে পারেন, আল্লামা আলুসী র. এর 'তাফসীরে রুহুল মাআনী' ২২-৪৮ পৃষ্ঠা এবং মওলানা আবদুল হই লক্ষ্ণৌভীর, 'আররফউ ওয়াততাফসীল' গ্রন্থে শায়খ আবুগুদ্দা'র সংযোজিত টীকা।

১১. সহীহ্ বুখারী : সহীহ্ বুখারী সংকলক শায়খুল ইসলাম, ইমামুল হুফফায (হাদীস শাস্ত্রের হাফেজদের ইমাম) আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা আলজা'ফী আলবুখারী। তাঁর এ কিতাবকে কুরআনে করীমের পর সবচেয়ে সহীহ্ হাদীসের সংকলন মনে করা হয়। ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫৬ হিজরী সনের ঈদুল ফিতরের দিন ইন্তিকাল করেন। উল্লেখিত হাদীসটি বুখারী শরীফের কিতাবুদ দিয়াতের 'আল্লাহ্ তাআলার বাণী, 'যে ব্যক্তি মুসলিমকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে' বাবে সংকলিত হয়েছে। এ হাদীসটি ইমাম আহমদ তাঁর সংকলিত মুসনাদের ২য় খণ্ডের ৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম এই হাদীসটি বুখারী শরীফে নেই বলে সংশয় পোষণ করেছেন। ইমাম হাকেম প্রণীত 'আল মুসতাদরাকের ৪র্থ খণ্ডের ৩৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, এই হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ্ কিন্তু সহীহ্ বুখারীতে এটি বর্ণিত হয়নি।

১২. আলউসাইলী : বলে তৎকালীন আন্দালুসিয়ার টলোডো অঞ্চলের উসাইলা শহরের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে উসাইলী বলতে যাকে বুঝানো হয়েছে তাঁর নাম আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি সহীহ্ বুখারীকে অত্যন্ত শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন।

উসাইলীর বর্ণনাসূত্র হলো, উসাইলী আবু যায়েদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মারদুযী থেকে, আবু যায়েদ আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আত্তার বিন সালেহ বিন বশীর আল ফারিরী থেকে এবং আবু আবদুল্লাহ্ ইমাম বুখারী থেকে রেওয়ায়েত করেন।

উসাইলী ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু হানিফা র. এর মতবিরোধ পূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থটির নাম ছিল 'আদদালাইলু আলা উম্মাহাতিল মাসাইল'। দুর্ভাগ্যের বিষয় উল্লেখিত কিতাবটি এখন আর পৃথিবী পৃষ্ঠে নেই। স্মর্তব্য, ইমাম ইবনে তুল্লা তাঁর এ কিতাবে উসাইলী সূত্রেই বেশি হাদীস সংকলন করেছেন। ৩৯২ হিজরী সনে আন্দালুসে ইমাম উসাইলী ইন্তিকাল করেন। ইবনুল ফারদী আত তারিখুল উলামাউ ওয়ার রুআতু বিল আন্দালুস নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৪৯ পৃষ্ঠায় ইমাম উসাইলীর পরিচিতি দিয়েছেন। আল হুমাইদী জাযওয়াতুল মুকতাবিস-এর ২৫৭-২৫৮ পৃষ্ঠায় য়াকুত হামুবী মু'জামুল বুলদান এর ১ম খণ্ডের ১৩ পৃষ্ঠায়, হাফেজ যাহবী তাযকিরাতুল হুফফায এর ৩য় খণ্ডের ১০২৪ পৃষ্ঠায় এবং খতীব বাগদাদী 'ইযাহুল মাকনূন' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৭৭ পৃষ্ঠায় ইমাম উসাইলীর পরিচিতি উল্লেখ করেছেন।

১৩. আলকাবিসী : আলকাবীস একটি শহরের নাম। সেখানেই তাঁর জন্ম। তৎকালীন আফ্রিকার মাহদিয়া অঞ্চলের একটি শহর কাবিস। নাম আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খলফ আলম মুআফিরী। ইবনুল কাবিসী উপনামেই তিনি খ্যাত। এই মনীষী হাফেযে হাদীস ও অত্যন্ত উঁচু মানের ফকীহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। সহীহ বুখারীর রাবীদের মধ্যে তিনিও একজন। আলকাবিসী এবং উসাইলী উভয়েই আবু যায়েদ মারদুযী থেকে রেওয়ায়েত করেন। ৪০৩ হিজরী সনে এই মহান মনীষী ইন্তিকাল করেন। তাঁর সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে দেখুন ওয়াকিয়াতুল আ'য়ান লি ইবনে খালকান, খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ৩২০-৩২২। তাযকিরাতুল হুফফায্লি যাহবী, খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা ১০৭৯। কাশফুয-যুনূন হাজী খলীফা, পৃষ্ঠা ১৮১৮।

১৪. আল খাত্তাবী : আল খাত্তাবী ছিলেন হাদীস এবং হাদীস সম্পর্কীয় সমালোচনা ও পর্যালোচনা শাস্ত্র তথা উলূমে হাদীস ও ইলালে পারদর্শী। নাম : আবু সুলায়মান হামদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে খাত্তাব আল বুসতী। বুসত সাজিস্তান ও হিরাতের মাঝামাঝি এলাকার একটি শহরের নাম। তার রচনাবলীর মধ্যে নিম্নের কয়টি সম্পর্কে আলোচনা আছে। তন্মধ্যে

১. শরহে আবু দাউদ প্রকাশিত হয়েছে।

২. গরীবুল হাদীস এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে হাতে লেখা এর কপি ইস্তাম্বুলের মাকতাবা আল ফাতেহ নামক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। এটির লাইব্রেরী নম্বর ১১৪। তবে এই কপিটি অসম্পূর্ণ। অবশ্য এর পূর্ণাঙ্গ কপি একই লাইব্রেরীতে রয়েছে ১১৫ নম্বরে। এর আরো বিশদ অবগতির জন্যে দেখা যেতে পারে। 'আলমাখতুতাতুল মুসাওয়ারাতু লি জামি আদ্‌দুআলিল আরাবিয়া' খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৯।

১৫. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা : নাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ইবনে আবী ইমরান মায়মূন আল হিলালী আবু মুহাম্মদ আলকুফী। তিনি হাদীসের অত্যন্ত বিজ্ঞ ইমাম ছিলেন। সুফিয়ান ছিলেন সেই দুজনের একজন যে দুজন সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ বলেছিলেন, ইমাম মালিক ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা জন্মগ্রহণ না করলে হিজাযের ইলম নিঃশেষ হয়ে যেতো। ১৯৮ হিজরী সনে সুফিয়ান

ইবনে উয়াইনা ইন্তিকাল করেন। আসমাউর রিজালের সকল গ্রন্থেই সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার পরিচিতি উল্লেখিত হয়েছে।

১৬. 'সাক্ষ্য হিসেবে তরবারিই যথেষ্ট : ভাষ্যকার ড. জিয়াউর রহমান ফারুকী বলেন, উল্লেখিত শব্দসংযোগে এ হাদীস আমি খুঁজে পাইনি। সুনানে ইবনে মাজা ২য় খণ্ডের ৮৭৯ পৃষ্ঠায় 'হুদুদ অধ্যায়ের' কেউ যদি স্ত্রীর বিছানায় অন্য পুরুষকে পায়' পরিচ্ছদে কাবিছা ইবনে হুরায়ছ থেকে এবং তিনি সালামা ইবনুল হাক থেকে রেওয়ায়েত করেন। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে যখন আয়াত নাযিল হলো, অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল সাহাবী সাদ ইবনে উবাদার কাছে আবু সাবিত জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি যদি তোমার স্ত্রীর সাথে শোয়া অবস্থায় কোন পরপুরুষকে দেখতে পাও তাহলে কি করবে?' আমি তরবারি দিয়ে উভয়কেই হত্যা করে ফেলবো। এটা কিভাবে সম্ভব, আমি তাদের আপত্তিকর অবস্থা দেখেও চারজন সাক্ষি সংগ্রহের খোঁজে চলে যাবো, আর ঐ লোক এই ফাঁকে তার কাজ সেরে যাবে! নয়তো আমি যদি বলি 'অমুককে আমি এমন জঘন্য কাজ করতে দেখেছি' কিন্তু স্বপক্ষে সাক্ষী উপস্থাপন না করি, তাহলে উল্টো আমার উপরই মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি 'হদ্দে কযফ' লাগানো হবে এবং জীবনে আর কখনো আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।' সা'দ ইবনে উবাদা রা. এর এই উক্তি যখন রসূল স. এর কাছে ব্যক্ত করা হলো, তখন তিনি মন্তব্য করলেন, 'তরবারির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। অতপর বললেন, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার ভয় নেশাখোর ও অতি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন লোকজন এই সুযোগে আবার খুন করতে শুরু না করে। আবুসীরী আয্যাওয়ায়েদ গ্রন্থে লিখেছেন, এই হাদীসে কাবীসা বিন হুরাইস বিন কাবিসা নামক রাবী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে। ইবনে হিব্বান তাঁকে ছিকাহ রাবীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কাবিসা ছাড়া এই সনদের অন্যান্য বারী ছিকাহ! এ হাদীসটি সম্পর্কে 'তালাক অধ্যায়ের' 'লিআ'ন' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইবনে কাসীর 'আল বা'সূল হাসীস গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠায় বলেন, ইমাম বুখারী র. এর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট হলো তিনি যখন কোন রাবী সম্পর্কে বলেন, 'উলামা তার ব্যাপারে নীরব' কিংবা কোন হাদীস সম্পর্কে বলেন, 'এটির ব্যাপারে চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে' তাহলে বুঝতে হবে উক্ত রাবী তাঁর দৃষ্টিতে একেবারেই নিম্নমানের। কারো সম্পর্কে সমালোচনার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী এমন নমনীয় শব্দই প্রয়োগ করেন। এ ব্যাপারটি আমাদের জানা থাকা জরুরি।

ইবনুল কাততান বলেন, ইমাম বুখারী র. যদি কাউকে 'মুনকারুল হাদীস' বলেন, তবে সেই রাবী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা মোটেও ঠিক নয়। মীযান, যাহবী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৫।

১৭. এ হাদীসটি ইবনু মাজার (২য় খণ্ডের ৮৭৩ পৃষ্ঠায়) দিয়াত অধ্যায়ের মুসলিম হত্যার কঠোর দণ্ড পরিচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনে আয়ায সূত্রে উকবা ইবনে আমের আলজুহানী থেকে মারফু রীতিতে রেওয়ায়েত করেছেন। অবশ্য তার বর্ননা 'বিদামিন হারামিন' অন্যায় হত্যা শব্দ অতিরিক্ত রয়েছে। আলবুসিরী আযযাওয়ায়েদ গ্রন্থে বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ তবে আবদুর রহমান আয়ায-এর উকবা ইবনে আমের থেকে সরাসরি শোনার ব্যাপারটি নিশ্চিত প্রমাণিত হতে হবে।

কারণ বলা হয়, আবদুর রহমান মুরসাল রীতিতে উকবা ইবনে আমের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি সরাসরি উকবার কাছ থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি।

আবদুর রহমান ইবনে আয়ায এর ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে মুনাদ্দাহ বলেন, ইমাম বুখারী আবদুর রহমান ইবনে আয়াযকে সাহাবী মনে করেন। ইবনে আসাকীর বলেন, ইমাম বুখারী এমনটি করেননি। আবু হাতেম বলেন, আবদুর রহমান রসূল স. এর যুগ পাননি। তাছাড়া তিনি একজন দুর্বল সূত্র। মোদ্দা কথা হলো, হযরত আলী, উমর ও মুআবিয়া রা. থেকে আবদুর রহমান মুরসাল রেওয়ায়েত করেছেন। উকবা ইবনে আমের থেকে সরাসরি তার হাদীস শ্রবণের কথা কেউ বলেননি। তাহযীবুত তাহযীবে (খণ্ড-২ পৃষ্ঠা ২০৩) হাদীসটির সাথে একটি কাহিনী জড়িয়ে আছে। ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের, ১৪৮ পৃষ্ঠায় ইয়াযীদ ইবনে হারুণ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেন, ইসমাঈল ইবনে আবু খালীদ, আবদুর রহমান ইবনে আয়ায শামী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, উকবা ইবনে আমের আল জুহানী মসজিদে আকসায় নামায পড়তে এলে লোকজন তাঁর পিছু নিল। তিনি লোকজন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমার পিছু পিছু কেন আসছো? তারা বললো, আপনি রসূল স. এর সান্নিধ্যে ছিলেন। তাই কিছু সময় আমরা আপনার সংস্পর্শে থাকতে চাচ্ছি। উকবা তাদের বললেন, তবে দাঁড়াও, এখানে নামায পড়ো। অতপর সবাই তাঁর পিছনে নামায পড়লেন। নামাযান্তে তিনি উপরোল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১৮. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর প্রণীত সুনানে 'কিতাবুল ফিতান বাবু ফি তা'যীমে কাতলিল মুমিন' এ খালিদ বিন দাহকান থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। খালিদ ইবনে দাহকান বলেন, আমি কুসতুনতুনিয়া যুদ্ধে গেলাম, তখন যুলাইফা নামক স্থানে একজন অভিজাত ফিলিস্তিনী এলেন। তাকে সবাই চিনতো। তার নাম হানি ইবনে কলসুম ইবনে শুরাইক কিনানী। লোকটি এসে আবদুল্লাহ ইবনে আবু যাকারিয়াকে সালাম দিল। আবদুল্লাহ তাঁর পূর্ব পরিচিত। এ হাদীসের রাবী খালিদ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু যাকারিয়া আমাকে বলেছেন, আমি উম্মে দারদা থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, নবী করীম স. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে সব গোনাহ মাফ করে দিতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, অথবা কোন মুমিন যদি কোন মুমিনকে ইচ্ছা করে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।' এ কথা শুনে হানী ইবনে কলসুম বলেন, আমি মাহমুদ বিন রবী' থেকে শুনেছি। তিনি উবাদা বিন সামিত থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম স. বলেছেন, কোন মুসলমান যদি কোন মুমিনকে হত্যা করে এবং এ হত্যাকাণ্ডের জন্য সে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তবে আল্লাহতাআলা তার কোন নেক আমলই কবুল করেন না।

গ্রন্থকার ইবনে তুল্লা বলেন, অত:পর খালিদ আমাদের বলেন, ইবনে আবু যাকারিয়া উম্মে দারদা সূত্রে এবং উম্মে দারদা আবু দারদা সূত্রে একই হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য তাঁর বর্ণিত হাদীসে 'সালিহান মুনিকান' এর স্থলে মুনিকান সালিহান' শব্দ বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ ও আল মুনযিরী এ শব্দের তারতম্যের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি।

ইমাম হাকিম আল মুসতাদরাকে এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে রিওয়ায়েত করেন, এটির সনদ সহীহ বলে মন্তব্য করেন। অবশ্য ইমাম বুখারী বুখারীতে এবং ইমাম মুসলিম মুসলিমে এ হাদীস বর্ণনা করেননি।

খালিদ ইবনে দাহকান আবু আল মুগীরা আল দামেশকী নামে পরিচিত। তিনি মকবুল পর্যায়ের ছিকাহ রাবী।

১৯. মুসনাদ আল বাক্কী : বাক্কী ইবনে মাখলাদ, 'মুসনাদ আল কবীর' এর প্রণেতা। তিনি কর্ডোভার অধিবাসী ছিলেন। আবু আবদুর রহমান তার উপনাম। আল কুত্তানী 'আর রিসালাতু আল মুতারফা' এর ৭৪/৭৫ পৃষ্ঠায় ইবনে হাযম এর বরাতে লিখেছেন, 'বাক্কী তাঁর মুসনাদ আল কবীর গ্রন্থে এক হাজার তিনশ থেকে কিছু বেশি সংখ্যক সাহাবী থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। উল্লেখিত কিতাবটি ফিকহের পদ্ধতিতে গ্রন্থিত হয়েছে। এটি এক অর্থে মুসনাদ আবার এক অর্থে মুসান্নাফ। এমন কিতাব অপর কেউ গ্রন্থনা করেননি। ২৭৬ হিজরী সনে বাক্কী ইন্তিকাল করেন। বাক্কী সম্পর্কে আরো বিশদ জানার জন্য দেখুন, আদ্‌দাব্বী প্রণীত বাগয়াতুল মুলতামিস, পৃষ্ঠা ২৪৫।

আল হুমাইদী প্রণীত 'জযওয়াতুল মুকতাবিস (পৃষ্ঠা ১৭৭) হাফেজ যাহবী প্রণীত 'তাযকিরাতুল হুফফায (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬২৯)। ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম তাঁর প্রণীত 'জাওয়ামিউস সিরাত' গ্রন্থের পুরো একটি অধ্যায়ে (২৭৫-৩১৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) এ হাদীসের রাবী, সাহাবায়ে কেরামের নাম ও রেওয়ায়েত সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। এ অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে তিনি সর্বশেষ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, 'আমাদের জানামতে খালিদ ইবনে দাহকান রসূল স. এর কাছ থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনাকারী সর্বশেষ সাহাবী। এর আগে ইমাম হাফেয বাক্কী বিন মাখলাদ আন্দালুসী এবং তার পূর্বসূরী আলেমগণও এ কথা ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম বাক্কী বিন মাখলাদ র. এর উক্ত কিতাবটি এখন আর পৃথিবী পৃষ্ঠে নেই। ব্রুকলম্যান 'তারিখে আদাবে আরাবী' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠায় একই কথা লিখেছেন। আল্লামা আবদুর রহমান মোবারকপুরী প্রণীত 'তুহফাতুল আহওয়াযী'র ১ম খণ্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ইমাম বাক্কীর পূর্বোক্ত কিতাবটির একটি কপি জার্মানীর একটি লাইব্রেরীতে রয়েছে। কিন্তু বহু আলেম জার্মানীতে এ কিতাবটি খোঁজাখুজি করেছেন কিন্তু তারা কেউ সেটির সন্ধান পাননি।

সাম্প্রতিক কালে আলেমদের কয়েকজন একটি সুন্দর কাজ করেছেন। তারা বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে থাকা ইমাম বাক্কীর বর্ণনাগুলোকে একত্রিত করে সেগুলোকে গ্রন্থাবদ্ধ করে 'মুসনাদে বাক্কী বিন মাখলাদ' নামকরণ করেছেন।

২০. মুসনাদ আলবাযযার : নাম, হাফেয আবু বকর আহমদ ইবনে উমর ইবনে আবদুল খালেক আলবাযযার। ২৯২ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি একটি মুসনাদ গ্রন্থনা করেন। তাতে হাদীসের সনদ ও ইবারত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। জঈফ রেওয়ায়েতগুলোর ব্যাপারেও আলোকপাত করেছেন। আলবাযযার এর বিশদ পরিচিতির জন্য দেখা যেতে পারে, খতীব বাগদাদী প্রণীত, তারীখে বাগদাদ ৪র্থ খণ্ড ২৩৪ পৃষ্ঠা। ইমাম যাহবীকৃত 'তাযকীরাতুল হুফফায খণ্ড-২, পৃষ্ঠা

৬৫৩ এবং মীযানুল ই'তিদাল খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১২৪, ইবনুল ইমাদ হাম্বলী প্রণীত 'শাজারতুয যাহাব' (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০৯) এবং আলখুত্তানীর 'আররিসালাতু আলমুসতারফাহ পৃষ্ঠা ৬৮।
মুসনাদ আল বাযযার এর একটি হাতে লেখা কপি ইস্তাম্বুলের মোল্লা লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। সেই লাইব্রেরীতে এর সংগ্রহ নম্বর ১০ কাফ ৫৭২)।
হযরত আবু বকর রা. এর রেওয়ায়েত দিয়ে এটির সূচনা করা হয়েছে এবং সমাপ্ত করা হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণিত হাদীসে। এই সংস্করণের প্রথমাংশটি কিছুটা বিনষ্টের শিকার হয়েছে। বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, ফিহরাস আল মাখতুতা আল মুসাওয়ারা, লি জামিয়াতি দুয়ালিল আরাবিয়া খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৯/১০০) হাফিয নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আল হাইসামী (মৃত্যু ৮০৭ হি:)। আল বাযযার এর সেইসব হাদীসকে 'আলমাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবা আলফাওয়ায়েদ' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন যেসব হাদীস সিহাহ সিত্তাহতে সংকলিত হয়নি। আলহাসাসী মুসনাদে বাযযার ছাড়াও, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবুইয়ালা, মুসনাদে মুহাল্লা, মুসনাদে তাবরানীর সেসব হাদীসও সংকলন করেছেন যেগুলো সিহাহ সিত্তাহতে বর্ণিত হয়নি।
২১. আলহারবী : নাম ইবরাহীম ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর ইবনে আবদুল্লাহ আল বাগদাদী আল হারবী। উপনাম আবু ইসহাক। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। সব ধরনের দীনি ইলম সম্পর্কে তাঁর এতোটাই বুৎপত্তি ছিল যে, সমকালীন উলামা তাঁকে ইমাম গণ্য করতেন। 'গরীবুল হাদীস, মানাসিকে হজ্জ, সুজুদুল কুরআন এবং দালায়েলুন নবুওয়ত, নামে তিনি কয়েকটি উৎকৃষ্ট কিতাব রচনা করেন, যেগুলো এখন দুষ্প্রাপ্য। ইবনুল আসীর 'আননিহায়া ফি গারীব আল হাদীস ওয়াল আসার এর মুকাদ্দিমায় আলহারবীর প্রশংসায় লিখেছেন, 'ইবনে কুতাইবার সময়ে ইমাম ইবরাহীম ইবনে ইসহাক আলহারবী গরীবুল হাদীস সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব প্রণয়ন করেন। এটি বহুখণ্ডে বিভক্ত ছিল। কোন একটি হাদীসে মাত্র একটি শব্দ গরীব হলেও ইমাম হারবী এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন। দীর্ঘ আলোচনার জন্যে কিতাবটি বেশি আদৃত হয়নি।
অথচ কিতাবটি খুবই উপকারী ছিল। ইমাম হারবী অত্যন্ত উচু মানের আলেম, ইমাম, হাফেয, ফকীহ মুহাদ্দিস, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক ছিলেন।
ইমাম হারবী ১৯৮ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৮৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। ইমাম হারবী সম্পর্কে বিশদ জানার জন্যে দেখুন, সিফাতু আসসাফওয়াতু ইবনে জাওযী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৮-২৩২, মু'জামুল উদাবা লিল বাগদাদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮, ৪৬, তারীখে বাগদাদ লিল-খতীব, খণ্ড ২৬, পৃষ্ঠা ৩৭-৪০, তাযকিরাতুল হুফফায লিয যাহবী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৮৪)।
এ হাদীসটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদের ৫ম খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠায় ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ সূত্রে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এবং কুদামা জাসারা বিনতে দাজাজা থেকে বর্ণনা করেন। জাসারা একবার উমরাহ পালনের জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি রাবযা নামক স্থান হয়ে যাচ্ছিলেন। রাবযায় হযরত আবু যর গিফারী অবস্থান

করছিলেন। তিনি আবু যর গিফারীকে রা. বলতে শুনেছেন, একদিন রসূল স. ইশার নামায পড়াতে এলেন। তিনি নামায পড়িয়ে শেষ করলেও কিছু লোক আরো নামায পড়তে থাকলো। রসূল স. তাদেরকে নামায পড়তে দেখে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। রসূল যখন দেখলেন, সবাই নামায শেষ করে চলে গেছে, তখন তিনি পুনর্বার তাঁর জায়গায় এসে নামায পড়তে শুরু করলেন। আমি এসে রসূল স. আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড়াতে ইশারা করলে আমি তাঁর ডান পাশে দাঁড়ালাম। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এসে রসূল স. ও আমার পেছনে দাঁড়ালো। রসূল স. আবদুল্লাহকে তাঁর বাম পাশে দাঁড়াতে ইশারা করলেন। অতপর আমরা তিন জন নিজ নিজ নামাযে মগ্ন হলাম। আমরা যে যতটুকু কুরআন শরীফ পড়তে পারতাম তাই নামাযে পড়ছিলাম। কিন্তু রসূল স. ফজর পর্যন্ত একই আয়াত পুনরাবৃত্তি করছিলেন। ফজরের সময় হয়ে এলে আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বললাম, একই আয়াতের বারবার পড়ার কারণ সম্পর্কে রসূলকে স. জিজ্ঞেস করুন। ইবনে মাসউদ আমাকে হাতের ইশারায় বললেন, এ ব্যাপারে রসূল স. যদি নিজে থেকে কিছু না বলেন, তাহলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারবো না। অগত্যা আমিই জিজ্ঞাসার্থে বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি রাতব্যাপী নামাযে একই আয়াত পড়ছিলেন, অথচ গোটা কুরআন শরীফই আপনার মুখস্ত। অন্য কেউ এমনটি করলে তো আমরা তার ওপর রাগ করতাম। জিজ্ঞাসার জবাবে রসূল স. বললেন, আমাকে এমন সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যদি সাধারণ লোকজন এ কথা জানতে পারে তবে তারা নামায ছেড়ে দেবে। আমি আরয করলাম, আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ জানাবো না? রসূল স. বললেন, কেন নয়? এ কথা শুনে আমি সেখান থেকে উঠে এতটুকু দূরে চলে গেলাম, একটি ঢিল ছুঁড়লে যতটুকু দূরে গিয়ে পড়ে। ঠিক এই সময় সেখানে হযরত উমর উপস্থিত হয়ে রসূল স. এর সুসংবাদের কথা শুনে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ স. আপনি যদি সাধারণ মানুষকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দেন তাহলে তারা ইবাদত ছেড়ে দেবে।' সাথে সাথে রসূল স. আমাকে ফিরে আসার জন্যে ডাকলেন, 'আমি সাথে সাথে ফিরে এলাম। নিম্নোক্ত আয়াতটি রসূলুল্লাহ স. বারবার তিলাওয়াত করছিলেন, 'তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা; আর যদি তাদের ক্ষমা করো তবে তুমি তো মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদা, আয়াত : ১১৮)।

ইবনে কাসীর (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১২১) এ হাদীস নকল করেছেন কিন্তু তিনি সেখানে এর শুদ্ধতার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি।

এ হাদীসে কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ নামক একজন রাবী আছেন। তিনি আল বাকার আল আমেরী আযযুহালী আবু রুহআল কুফী। মুহাদ্দিস ইবনে হিব্বান তাকে ছিকাহ রাবী হিসেবে গণ্য করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী তাকে মকবুল রাবী মনে করেন।

অনুবাদ : আবুশিফা মুহাম্মদ শহীদ

ইসলামী আইন ও বিচার
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা : ১০১-১০২

যৌন জীবন সম্পর্কে আল-কুরআনের বিধান

মু. শওকত আলী

১. মানব সৃষ্টি

ক. মানুষ কি মনে করে নিয়েছে তাদেরকে এমনিতে ছেড়ে দেয়া হবে?

খ. সে কি নিকৃষ্টতম পানির এক ফোটা শুক্র ছিল না, যা (মায়ের গর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয়?

গ. পরে তা একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো। পরে আল্লাহ তার দেহ বানালেন, এর অংগ প্রত্যঙ্গ সুসমান ও সংগতিপূর্ণ করে দিলেন।

ঘ. পরে তা থেকে পুরুষ ও নারী দু'ধরনের মানুষ বানালেন। (সূরা কিয়ামা আয়াত ৩৬-৩৯)

২. মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া

ক. আমরা মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে বানিয়েছি।

খ. পরে এটিকে এক বিশেষ স্থানে টপকানো ফোটায় পরিবর্তন করেছি।

গ. পরে এ ফোটাকে জমাট বাধা রক্তে পরিণত করেছি, এর পর এ জমাট বাধা রক্তকে মাংসপিণ্ড বানিয়েছি। অতঃপর এটিকে অস্তিমজ্জা বানিয়েছি। এ অস্তিমজ্জার ওপর গোশ্‌ত বানিয়েছি। শেষ পর্যন্ত এটিকে অপর এক সৃষ্টির রূপ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। অতএব, বড়ই বরকত সম্পন্ন হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি সব কারিগর হতে উত্তম কারিগর।

গ. তারপর তোমাদের অবশ্যই মরতে হবে।

ঘ. এবং পরে কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরাত্থিত হতে হবে। (সূরা আল মু'মিনুন আয়াত ১২-১৩)।

৩. মানব সৃষ্টির উপকরণ

ক. মানুষ এ টুকুন লক্ষ্য করুক না যে তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে?

খ. এক কম্পমান পানি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

গ. যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্তির মধ্য হতে নির্গত হয়।

ঘ. নিঃসন্দেহে তিনি (স্রষ্টা) তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। (সূরা আত ত্বারেক ৫-৮)

লেখক : বোর্ড সেক্রেটারী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ।

৪. মহিলাদের পরিচ্ছন্নতা

ক. তারা জিজ্ঞেস করে মহিলাদের ঋতুচক্র সম্পর্কে নির্দেশ কি? বল এটি এক অপবিত্র ময়লাযুক্ত অবস্থা। কাজেই তখন স্ত্রীদের হতে দূরে থাক এবং তাদের নিকটে যেও না। যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা পবিত্র ও ময়লামুক্ত হয়।

খ. তারা যখন পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট যাও সেভাবে যেভাবে আল্লাহ্ তাদের নিকট যেতে আদেশ করেছেন।

গ. যারা পাপ কাজ হতে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অর্জন করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আল বাকারা ২২২)

ঘ. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেতের মত, তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে যেভাবে তোমরা ইচ্ছা কর নিজেদের ক্ষেতে গমন কর। কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা কর। আল্লাহতাআলার নাফরমানি ও অবাধ্যতা হতে দূরে থাক। (সূরা আল বাকারা ২২৩)

লিগ্যাল এইড প্রতিবেদন

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর অন্যতম একটি বিভাগ লিগ্যাল এইড। ১৯৯৫ সনে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্মলগ্ন থেকে লিগ্যাল এইড বিভাগটির কাজ শুরু হয়। মুসলিম সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণ, নির্যাতিত ব্যক্তিবর্গকে আইনী সহায়তা প্রদান, দাম্পত্য বিরোধে আপোষ নিষ্পত্তি, নারী নির্যাতন রোধে আইনগত সহায়তা প্রদান, অন্যায়ভাবে বন্দি ও বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের জামিন করানো, সাজাপ্রাপ্তদের কারাভোগের পর পুনর্বাসন ইত্যাদি কাজগুলো আমরা করে আসছি।

গত মার্চ-০৭ থেকে জুলাই-০৭ মাসে যে সকল আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, তার একটি রিপোর্ট নিম্নে দেয়া হল।

রিপোর্ট এক (নারী ও শিশু নির্যাতন)

দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক নয়াদিগন্তসহ অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় মহিলাদের ঝগড়া মারামারির একটি তুচ্ছ ঘটনায় এক পক্ষ থানায় নালিশ করলে বিবাদী মহিলাকে তার নিরপরাধ শিশুপুত্রসহ প্রিজন ভ্যানে তুলে নেয়ার সংবাদ প্রকাশিত হলে অত্র সংস্থার

দুই চোখে অবোধ বিস্ময় নিয়ে কী দেখছে শিশুটি? আমাদের আইন, আমাদের সমাজকে!
(দৈনিক প্রথম আলো ০৯.০৪.২০০৭ইং)

লিগ্যাল এইড এর পক্ষ থেকে পর দিনই সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অত্র সংস্থার নিয়োজিত এ্যাডভোকেট মোঃ হাবিবুর রহমান ভূইয়া হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতির আদালতে সংবাদটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিরপরাধ শিশু পুত্রটির মুক্তি দেয়ার আবেদন করেন। আদালত মুক্তির আবেদন গ্রহণ করে মৌখিক ভাবে তাৎক্ষণিক সংশ্লিষ্ট

সকলকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেলকে নির্দেশ দেন এবং সেই মোতাবেক ব্যবস্থাগ্রহণ করে শিশু পুত্রটিকে তার মাসহ কারাগার থেকে মুক্ত করা হয় বিগত ১০ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে।

রিপোর্ট দুই ঃ (মিথ্যা ডাকাতির মামলা)

মিরপুর থানার একটি জটিল কেসে মোঃ বাবু, পিতা- মোঃ নুরুজ্জামান, সাং- লারকান্দী, থানা ও জেলা- লক্ষীপুর নামক বন্দিকে ১ বছর ৩ মাস অন্যায় ভাবে মামলা দিয়ে হয়রানী করা হচ্ছিল। উল্লেখিত আসামীর পিতার আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র সংস্থার তিনজন এ্যাডভোকেট জামিনের আবেদন করে সি এম এম আদালত থেকে জামিনের আদেশ লাভ করেন।

রিপোর্ট তিন ঃ (হয়রানী [illegible]ক মামলা)

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দা[illegible]ত্বশীল এর সাথে ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টারের জেনারেল সেক্রেটারী ও লিগ্যা[illegible] এ[illegible]ড সমন্বয়কারী সাক্ষাত করেন। তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। পরবর্তী সাক্ষাতে তিনি ১০ জন নিরপরাধ বন্দির তালিকা প্রদান করেন। কারাগারের বন্দি তালিকার মধ্যে দুইজনকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। আসামীরা হলেন, (১) মঞ্জুর হোসেন, পিতা- সিরাজুল হোসেন, সাং- উটখামার, মতিঝিল, ঢাকা। (২) আফসার উদ্দিন, পিতা- আতিকুল্লাহ, সাং- ৭১৬, পশ্চিম শেওড়াপাড়া, থানা- মিরপুর, জেলা- ঢাকা।

রিপোর্ট চার ঃ (হিল্লা বিয়ে)

দৈনিক জনকণ্ঠ, যুগান্তর, যায়যায়দিন সহ কয়েকটি প্রভাবশালী পত্রিকায় 'বগুড়ার গ্রামে হিল্লা বিয়ে চলছে যুগ যুগ ধরে' 'ফতোয়ার ভয়ে কেউ মুখ খুলছে না' শীর্ষক

বাঁ থেকে: হিল্লা বর কাইঞ্চা মিয়া, স্ত্রীকে হিল্লা বিয়ে প্রদানকারী হানজালা ও হিল্লা বিয়ের শিকার আছিয়া (দৈনিক যুগান্তর ০১.০৫.২০০৭ইং)

রিপোর্টগুলোর ভিত্তিতে ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে সরেজমিনে তদন্তের জন্য ২জন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। লিগ্যাল এইড প্রতিনিধিবৃন্দ তদন্ত করে দেখতে পান হিল্লা বিয়ের ঘটনা সত্য তবে ধর্মীয় শিক্ষার অভাবেই বগুড়ার ঐ এলাকার লোকেরা ইসলাম নির্দেশিত পুণর্বিবাহের নিয়মে বিকৃতি করে ফেলেছে। তাই সচেনতা সৃষ্টির জন্য রিচার্স প্রতিনিধিগণ শুক্রবার অত্র এলাকার মসজিদে জুমআর নামাজের পর এলাকার চেয়ারম্যান ও ঐ মসজিদের ইমামসহ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি ও জনতার সামনে হিল্লা বিয়ের প্রকৃত বিধান সম্পর্কে কুরআন-হাদিসের আলোকে আলোচনা রাখেন। সেখানে উপস্থিত এলাকার মাতব্বর ও উপস্থিত সকলেই বলেন সত্যিকারের পুণর্বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে (হিল্লা বিয়ে) আমাদের কোন ধারনা ছিল না। ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ মনে করে ঐ গ্রামসহ আশপাশের যে কয়েকটি গ্রামে হিল্লা বিয়ের প্রচলন রয়েছে সে সব গ্রামের সাধারণ মানুষকে হিল্লা বিয়ে সম্পর্কে আরো সচেতন করার জন্য বাস্তধর্মী কাজ করতে হবে। এজন্য ল' রিসার্চ সেন্টার প্রোগ্রাম তৈরী করছে।

– এস এম আবদুল্লাহ
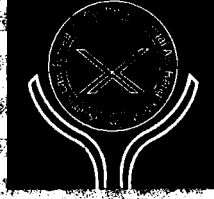
ইসলামী আইন ও বিচার
গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার' এর গ্রাহক / এজেন্ট হতে চাই

☐ আমার জন্য ☐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ☐ বছরের জন্য ☐ কপি প্রতি সংখ্যা

নাম ....

পদবী ....

পেশা ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

ঠিকানা ....

.... ফোন/মোবাইলঃ ....

গ্রাহক পত্রের সঙ্গে .... টাকা নগদ/মানি অর্ডার করুন।

কথায় (..)।

স্বাক্ষর স্বাক্ষর

ম্যানেজার

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না, ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন
২০ কপির উর্ধে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ৩৫X৪ = ১৪০/=

=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) =৩৫X৮ = ২৮০/=

=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য- (বার সংখ্যা) =৩৫X১২ = ৪২০-২০=৪০০/=

গ্রাহক ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬

E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

REGD. NO. DA 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : July-September -2007, TK : 35